পরিচয়

নব পর্য্যায়—১ম সংখ্যা জান্নুয়ারী : ১৯৫০ পৌষ : ১৩৫৬

সম্পাদক

গোলাম কুদ্দুস

সরোজ কুমার দত্ত

দাম : আট

MARXIST CLASSICS

K. MARX :

Civil war in France.	
Class Struggle In France	As. -/9/-
Eighteenth Brumaire of Louise Bonaparte	-/9/-
Critique of the Gotha Programme	-/9/-

F. ENGELS :

Origin of Family, Private Property and the State	-/3/-
Ludwig Fuerbach	Rs. 1/2/-

V. I. LENIN :

Selected Works Vol. 2.	As. -/9/-
What is to be Done	Rs. 3/12/-
Two Tactics of Social Democracy	As. -/15/-
Proletarian Revolution and Ranegade Kautsky	-/9/-
Imperialism, the Highest Stage of Capitalism	-/9/-
State and Revolution	-/9/-
Right of Nations To Self Determination	-/9/-

J. V. STALIN :

Problems of Leninism	-/-/-
Marxism and the National Question	Rs. 1/14/-
	As. -/3/-

To be had of :

NEW PUBLISHERS
6, Bankim Chatterjee St., Calcutta 12.

বিজ্ঞপ্তি

টাকাপয়সা, চেক, চিঠিপত্র, রচনা ইত্যাদি নীচের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

চাঁদার হার :

সডাক বার্ষিক— ৬৲
সডাক ষান্মাসিক— ৩৲
প্রতি সংখ্যা— ॥০

ম্যানেজার—পরিচয়
৬, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

চিন্মোহন সেহানবীশ সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত ও এজেন্সী প্রাপ্ত বই

লেনিনের লেখা—

গ্রামের গরীবদের প্রতি (৩য় সংস্করণ)	১৲
১৯০৫ সালের বিপ্লব	॥৶০
রাষ্ট্র ও বিপ্লব	২॥০
কার্ল মার্কসের শিক্ষা	॥০

স্তালিনের লেখা—

লেনিনবাদের ভিত্তি	১৲
(Problems of Leninism-এর প্রথম অংশের অনুবাদ)	
লেনিনবাদের সমস্যা—	৸০
(Problems of Leninism-এর একটি অংশের অনুবাদ)	
লেনিনবাদের সমস্যা—	১॥০
(লেনিনবাদের ভিত্তি ও সমস্যা একত্রে)	
সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস	হ্রাস মূল্য ৩৲
অক্টোবর বিপ্লব	॥০
কমিউনিস্ট ইশতেহার—মার্কস ও এঙ্গেলস —	॥৴০
গণরাষ্ট্রের একনায়কত্ব—মাও সে-তুং —	৶০
"বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা"—রবীন্দ্র গুপ্ত —	।০
অক্টোবর বিপ্লবের ৩২তম উৎসব—জি. ম্যালেনকভ —	৶০
কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরোর হাঙ্গেরি সম্মেলন [নভেম্বর ১৯৪৯] —	৶০

নিউ পাবলিশার্স
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মার্কসবাদী

(ষষ্ঠ সঙ্কলন)

এই সঙ্কলনে অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে আছে—

কমরেড স্টালিন ॥ সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের আহ্বান ॥ চীনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান জয় ॥ ভারতে ছাত্র আন্দোলন ॥ অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে লেনিন ও স্টালিন ॥ উনবিংশ শতকের বাঙলায় বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা ॥ উনবিংশ শতাব্দীতে সাঁওতাল জাগরণ।

দাম : এক টাকা চার আনা।

BHOWANI SEN GRANTHAGAR O GABESANA KENDRA

RECENTLY FROM MOSCOW

PHILOSOPHY

Dobrolyubov : Selected Philosophical Works — Rs. 5/10/-

Belinsky : Selected Philosophical Works — Rs. 4/10/-

HISTORY

History of the USSR Vol 3. — Rs. 3/6/-

Constitution of USSR — As. -/6/-

SCIENCE

I.V. Mitchurin : Selected Works — Rs, 7/8/-

ON THE SITUATION IN BIOLOGICAL SCIENCE (Proceedings Of The Lenin Academy Of Agricultural Science Of The USSR) — Rs. 3/11/-

T. D. LYSENKO : Soviet Biology — As. -/4/-

Can be had from :

NEW PUBLISHERS
6, Bankim Chatterjee St., Calcutta 12.

পরিচয়

পৌষ : ১৩৫৬

সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের আহ্বান

[কলিকাতা অধিবেশনের মূল প্রস্তাব]

আমরা ভারতের সকল স্থানের জনগণের প্রতিনিধি।

আমরা নর-নারীগণ—ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক, খেতমজুর, গণতান্ত্রিক যুবক ও নারী, প্রগতিশীল শিল্পী, লেখক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদদের গণ-সংগঠন ও বহুবিধ কর্মজীবীদের প্রতিনিধি।

যে যুদ্ধের বিপদ আজ দুনিয়ার সকল মানুষকে বিপন্ন করে তুলেছে—সেই যুদ্ধের বিষম বিপদ সম্পর্কে আমরা সচেতন।

আমরা জানি যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-লিপ্সুদের ষড়যন্ত্রেই দুনিয়ার শান্তি আজ বিপন্ন। এই যুদ্ধ-পাগলেরা যুদ্ধের হুমকি থেকে এখন প্রকাশ্য যুদ্ধ প্রস্তুতিতেই মেতে উঠেছে।

দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে—গ্রীসে, ভিয়েৎনামে, বর্মায়, মালয়ে—আমেরিকা, ফরাসী ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সশস্ত্র ফৌজ বাস্তবপক্ষে আক্রমণাত্মক যুদ্ধই চালিয়ে যাচ্ছে। এই সাম্রাজ্যবাদীরাই ঐ সকল দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও গণতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষভাবেই সাহায্য করছে—তাদের দেশের জনতাকে পিষে মারার জন্য—যে জনতা আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীরা দুনিয়ার শান্তিকে আরও বিপন্ন করে তুলেছে।

তারা আটলান্টিক চুক্তির মত সামরিক জোট তৈরি করে সম্মিলিত জাতিসংঘের বনিয়াদকেই ভেঙে দিচ্ছে—যে জাতিসংঘ তৈরী হয়েছিল সমস্ত

জাতির ভিতর শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের পুনরভ্যুত্থানকে রোধ করার জন্য।

তারা পশ্চিম জার্মানি ও জাপানকে আবার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করছে ও সেই সব দেশের ফাশিস্ট শক্তিগুলিকে আবার সঞ্জীবিত করে তুলছে।

আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ও দুনিয়াকে গ্রাস করার উদ্দেশ্য নিয়েই বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাকে পায়ে দলে তারা দুনিয়ার সকল স্থানে ঘাঁটি তৈরি করছে।

বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে চুক্তিতে বিভিন্ন ধরণের সমাজ ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ ভাবে পাশাপাশি থাকার সম্ভাবনাকে স্বীকার করা হয়েছিল—সেই চুক্তিগুলিকেই তারা আজ বরবাদ করে দিয়েছে।

এটম বোমার বিভীষিকা দ্বারা তারা আজ দুনিয়ার লোককে ভয় দেখিয়ে বশ্যতা স্বীকার করাতে চাচ্ছে।

শ্রমিকের রক্তে তৈরী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অতিরিক্ত মুনাফা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আর একটি যুদ্ধে জনগনকে ভুলিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা সংবাদপত্র, ছায়াচিত্র, সাহিত্য ও বিবিধ উপায়ে যুদ্ধের উত্তেজনামূলক প্রচার চালাচ্ছে।

তারা দুনিয়ার সর্বত্র গণতন্ত্রবিরোধী ও জনগণের দুশমন গভর্নমেন্টগুলিকেই সাহায্য করছে—যেমন স্পেনে তারা সাহায্য করছে ফ্রাংকোর গভর্নমেন্টকে ও গ্রীসে ফাশিস্ট সরকারকে।

সাম্রাজ্যবাদীদের এই সব চেষ্টায় শুধু দুনিয়ার শান্তিই বিপন্ন হচ্ছে না, দুনিয়ার জনগণের স্বাধীনতাও বিপন্ন হয়ে পড়েছে এবং এ সবের উদ্দেশ্য হল—একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অতিরিক্ত মুনাফা আরও বাড়িয়ে তোলা ও উপনিবেশগুলির জনগণের পরাধীনতা ও দাসত্বকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করা।

সর্বোপরি, সাম্রাজ্যবাদীদের এই সব চেষ্টার উদ্দেশ্য হল, সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান—যে জনগণ একটা উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের এই সব চেষ্টার উদ্দেশ্য হল—পূর্ব ইওরোপের ও স্বাধীন চীনের গণরাষ্ট্রগুলিতে যে নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। আমেরিকার পরিচালনায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পাগলের মত হয়ে উঠেছে দুনিয়াকে গ্রাস করার জন্য—যার পরিণতি হবে যুদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাত্র চার বছর পরেই জনগণের সামনে দেখা দিয়েছে আবার নতুন যুদ্ধের মহা বিপদ। সেই বিশ্বযুদ্ধ এনেছিল বিরাট ধ্বংস ও জনগণের অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণা—যার আঘাত জনগণ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ভারতের জনমতের বিরুদ্ধেই নেহরু সরকার ভারতকে বৃটিশ কমনওয়েলথের নাগপাশে বেঁধে রাখতে রাজী হয়েছে—এইভাবে নেহরু সরকার জোর করেই ভারতকে ইঙ্গ-আমেরিকান নেতৃত্বে যুদ্ধ-শিবিরের অংশীদার করেছে।

ভারতের জনমতের বিরুদ্ধেই নেহরু সরকার ভারতকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছায় এশিয়াকে সামরিক অভিযান চালানর পরিকল্পনায় জুড়ে দিয়েছে। ভিয়েৎনাম, বর্মা ও মালয়ের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকারী জনতার বিরুদ্ধে সেই সব দেশের প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্র-বিরোধী সরকারগুলিকে সাহায্য করার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনায়ও নেহরু সরকার ভারতের জনমতের বিরুদ্ধে ভারতকে সামিল করেছে।

বৃটিশ ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশমত যুদ্ধের পরিকল্পনায়ও ভারতের বড় বড় পুঁজিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্যই নেহরু সরকার দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট এবং চড়া দাম, বেকারি ও দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত ভারতের জনগণের কাঁধে সামরিক ব্যয়ের অসহনীয় বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। জনগণের উপর চলছে একটা ভয়াবহ সন্ত্রাসরাজ ও তাদের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

নেহরু সরকারের এই সব কাজে শুধু ভারতের জনগণের ধ্বংস ও সর্বনাশই ডেকে আনছে না, এতে সারা দুনিয়ার শান্তিকামী জনগণের পক্ষেও এক বিষম বিপদ সৃষ্টি করছে। নেহরু সরকারের এইসব কাজে ভারতের জনগণের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং আমেরিকান ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুমের কাছে সেই সার্বভৌমত্বকে সঁপে দেওয়া হচ্ছে।

আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, আজ শান্তি জনগণের সবচেয়ে প্রধান ও জরুরী দাবি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধলিপ্সু ও তাদের অনুচরদের সমস্ত পরিকল্পনাকে খতম করার জন্যই আমরা ভারতের সমস্ত নরনারীকে আহ্বান জানাচ্ছি—যে সকল নীতি ও কাজ ভারতকে যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করছে, যাতে ভারতকে ইঙ্গ-আমেরিকান পরিচালনায় আক্রমণাত্মক যুদ্ধ-শিবিরে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে—তাকে প্রতিরোধ করতে।

বৃটিশ কমনওয়েলথের অংশীদার হওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চালানর জন্য আমরা সমস্ত জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি। বৃটিশ কমনওয়েলথের অংশীদার হওয়ার অর্থই হল দুনিয়ার জনগণের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ-শিবিরে যোগ দেওয়া।

আমরা বিশ্ব-শান্তি সম্মেলনের ঘোষণাকে জানাচ্ছি স্বাগত সম্ভাষণ প্যারিসের বিশ্ব-সম্মেলনের শান্তি কমিটিকে জানাচ্ছি আমাদের পূর্ণ সমর্থন।

আমরা সম্মিলিত জাতিসংঘের সনদের পক্ষে।

তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও ঘোষণা করছি :

যে সকল সামরিক চুক্তি এই সনদের পরিপন্থী ও যার ফলে হবে যুদ্ধ—আমরা তার বিরোধী।

আমরা চাই—যুদ্ধের কাজে এটম বোমা নিষিদ্ধ হোক ও সেই নিষেধকে কার্যকরী করার জন্য তার উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। আমরা চাই—স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে সমস্ত জাতির ভিতর শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা।

প্যারিসের শান্তি ইস্তাহারের ভাষায় আমরাও ঘোষণা করছি, শান্তি রক্ষা করাই আজ দুনিয়ার সকল লোকের স্বার্থ।

আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণকে এবং পূর্ব ইওরোপের গণরাষ্ট্রগুলির ও স্বাধীন চীনের জনগণকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁরা দুনিয়ার সব দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের সঙ্গে এক বিশ্ব-শান্তি ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ও গড়ে তুলেছে শান্তির সুদৃঢ় ও অপরাজেয় শক্তি।

আমরা তাঁদের কাছে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি—ভারতের সমস্ত জাতির, সমস্ত মতের, সমস্ত পেশার লোকের জবরদস্ত জমায়েত গড়ে তুলে আমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করব, অন্যদেশের জনগণের স্বাধীনতা ধ্বংস করার কাজে ভারতের জনবল, ধনবল ব্যবহারে বাধা দেবো। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করব, সামরিক ব্যয়ের দুঃসহ বোঝার প্রতিবাদ জানাব এবং যুদ্ধ-প্রস্তুতির কাজে ব্যবহার হতে অস্বীকার করব।

শান্তির জন্য সংগ্রামই স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জীবনের জন্য সংগ্রাম।

আসুন—শান্তির সংগ্রামে জয়লাভের জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হই।

কবিতাগুচ্ছ

আমাদের লেনিন

"আমি লেনিনের শিষ্য মাত্র, এবং লেনিনের যোগ্য শিষ্য হওয়াই আমার লক্ষ্য।"—স্টালিন

"আপনারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারেন—মজুর শ্রেণীর স্বার্থে, মজুর-বিপ্লবের স্বার্থে, দুনিয়াব্যাপী কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে ভবিষ্যতেও আমি আমার সমস্ত শক্তি, সমস্ত কর্মক্ষমতা, এমন কি আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।"—স্টালিন

"তুমি তাঁকে জানতে পারনি, কিন্তু তিনি তোমাকে জানেন এবং তোমার স্বার্থে কাজ করেছেন। তুমি যেই হও, এই উপকারী বন্ধুকে তোমার প্রয়োজন।"—আঁরি বারবুস

* * *

মানুষের জীবন জীবিকা প্রেম সুখ শান্তি স্বাধীনতা মুক্তি কামনার
বিশ্বজোড়া প্রতিমূর্তি, মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মপ্রতিষ্ঠার
অবিশ্রান্ত সংগ্রামের সব্যসাচী অভ্রান্ত নায়ক
মানুষের মধ্যে সব চেয়ে যে মানুষ
অত্যন্ত সাধারণ
স্বতন্ত্র ধাতুতে গড়া সে অসাধারণ
গ্রহ মধ্যে সূর্যের মতন
শ্রেষ্ঠতম মহত্তম
প্রাণের চেয়েও প্রিয় প্রিয়তম মানুষের একান্ত আপন
সহজ সরল স্নিগ্ধ ফুলের মতন,
আবার ভীষণ
সাক্ষাৎ যমের মতো
মানুষের শত্রুদের
শত্রুদের বুকে হিংস্র একাগ্র সঙ্গিন—

বিপ্লবের কারুকর্মী
কমিউনিস্ট নেতা সেই
নিজে নাম নিয়েছে লেনিন!

ইতিহাস দিয়েছে তার
নতুন আরেক নাম
সোভিয়েট-সারথি স্টালিন।
লেনিনের হাতে গড়া ইস্পাত কঠিন
বিশুদ্ধ লেনিনবাদী কমরেড স্টালিন—
আমরা স্টালিনবাদী,
আমাদের তুমিই লেনিন।

অন্নদাতা শিক্ষাদাতা ভয়ত্রাতা
অনশন-বন্দী দুস্থ নিঃস্ব শোষিতের
মুক্তিদাতা পিতা তুমি
মজুরের তুমি রাজশক্তিপ্রতিষ্ঠাতা
যৌথজীবনযন্ত্রে কৃষকের নবজন্মদাতা—
তুমি দুঃখে দৈন্যে রোগে অভাবে নিগ্রহে
পীড়িতের আতুরের পরিত্রাতা
প্রসবব্যথায় আর্ত নিরাশ্রয় লাঞ্ছিত নারীর
তুমি বন্ধু, বিপন্নের পতিতের নিঃশঙ্ক আশ্রয়,
বিধবার পুত্র তুমি, বিধবার অনাথ পুত্রের
তুমি নাথ, অন্ধের চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধের নির্ভর,
তরুণের সহকর্মী প্রেমিকের মর্মসহচর,
বালকের খেলার সঙ্গী শিশুর জননী তুমি
জননীর বুকে তুমি প্রাণরস মানবশিশুর।

তোমার হাতের 'পরে
আঁতুড়ে জন্মায় শিশু
পূর্ণাঙ্গ সুঠাম সুস্থ জননীর বিনা বেদনায়:
তোমার বুকের 'পরে
নিরাপদে শিশু সুখে শান্তিতে ঘুমায়:
তোমার পায়ের তলে
বিষদাঁত-ভাঙা ঘেয়ো
কুকুর লোটায়।

অপরূপ অপরূপ
কোমলে কঠোরে তুমি সুসংগত সম্পূর্ণ মানুষ।
তোমার হৃদয়
মমতার খনি যেন অন্যায়ে নির্দয়।
উদ্দেশ্যে অসংশয়
সিদ্ধান্তে অমোঘ তুমি
সিদ্ধহস্ত প্রয়োগে সার্থক।
নিষ্ঠায় নিষ্ঠুর তুমি
সংকল্পে অনন্যমনা
চূড়ান্ত পরীক্ষা কালে
নিজেকেও কর না ক্ষমা—
ক্ষমা নেই বস্তুনিষ্ঠ বিচারে তোমার।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে স'হে
জ্ঞানপাপী ভীরু ক্লীব ভণ্ড বেইমান—
অব্যর্থসন্ধান
তোমার অলঙ্ঘ্য হাতে নেই নেই তাদের নিস্তার।
সম্মুখ সমরে কিংবা বুদ্ধির খেলায়
সমষ্টির বলে বলী
অপ্রতিদ্বন্দ্বী তুমি
দ্বন্দ্বের নিয়মে প্রাজ্ঞ
সমাধান কর দ্বন্দ্ব-বিরোধের বিপ্লবক্রিয়ায়।

বিপ্লবের শত্রু যারা
নররক্তমাংসলোভে যারা যুদ্ধ চায়,
তাদের পরম শত্রু
তুমি ক্রুদ্ধ মানবিকতার
মূর্ত প্রতীক সম
বর্বরের বিরুদ্ধে উগ্র উদ্দীপ্ত ঘৃণায়
মারীভয়মুক্ত প্রাণ-পরিপুষ্ট শান্তি-কামনায়
শোষকের রক্ত নিয়ে রক্ত দাও শোষিতের অসাড় শিরায়
সারা দুনিয়ায়

দুর্বলের বল তুমি
বন্ধনজর্জর দেহে তুমি দৃপ্ত প্রাণের উচ্ছ্বাস,
কারাগারে দেয়াল-ভাঙা বজ্রধর তুমি রুদ্র ঝড়—

আবার ঝড়ের মধ্যে
স্থিরচিত্ত কেন্দ্র তুমি
দৃঢ় হাতে বিশ্বশান্তি কর সংগঠন,
বিশ্বকর্মা ভেঙে ভেঙে সৃষ্টি কর নতুন ভুবন।
বিজ্ঞানকুশল শিল্পী আশ্চর্য স্টালিন—
তোমার তুলনা শুধু
অনুপম তুমিই লেনিন।

তোমার দক্ষিণ হাতে
এটমের মহাশক্তি
মুক্তি পায় মানুষের বিপুল কল্যাণে :
তোমার কণ্ঠের স্বরে কালো মেঘে বজ্র ডাকে
রাক্ষসের হৃদ্‌কম্প জাগে প্রাণ-
বিদ্যুতের সাড়া জাগে হতাশ্বাস করুণ কঙ্কালে :
তোমার শিক্ষার বলে
মূক সে মুখর হয়
পঙ্গু গিরি পায়ে হেঁটে করে অতিক্রম :
তুমি জ্ঞান অস্ত্র তুমি
মেহনতী মানুষের
তুমি শক্তি অবিনাশী আশা ও সাহস।
জানি বা না জানি আমি
আমার মনের কথা
তুমি জান—তুমি জনমনের নায়ক :
বুঝি বা না বুঝি আমি
আমার মহৎ ভাগ্য
গড় তুমি—তুমি জনভাগ্যবিধায়ক :

তোমাকে দেখি না আমি
আমাকে রয়েছ ঘিরে সারাক্ষণ তন্দ্রাহীন তুমি পাহারায় :
যেখানে থাকি না আমি
রয়েছি তোমার মনে অমঙ্গল-নাশা বিশ্ববিপ্লবচিন্তায়।

স্টালিন
কমরেড স্টালিন!

তুমি আছ—তাই ধর্মঘটে দাবি করেছি আদায় :
তুমি আছ—তাই ক্ষেতে শস্য কেটে তুলেছি গোলায় :
তুমি আছ—তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস আজ খুলেছি সন্ধ্যায় :
তুমি আছ—তাই দেশদ্রোহী গুণ্ডা পুড়ে মরে দেশের ঘৃণায় :
তুমি আছ--তাই আমি আশা করি রোগমুক্তি অসুস্থ প্রিয়ার :
তাই চার বছরের কন্যাটি আমার
স্বপ্ন দেখে লাল টুকটুকে এক বর আসবে তার।

আসবে আসবে
পুরনো পাপীর জোট
কংস সব ধ্বংস ক'রে
আসবে আসবে সে যে—
সুখ শান্তি দেশে দেশে আসবে স্টালিন।
স্টালিন তোমার
তোমার শান্তির সেনা
দেশে দেশে লাখে লাখে ময়দানে হয়েছি শামিল :
লাঠিগুলি তুড়ি মেরে শহর কাঁপিয়ে পথে ঝাণ্ডা হাতে করেছি মিছিল।
তুমি আসবে স্টালিন
তুমি বার্লিনে এসেছো কাল
তুমি পিকিংয়ে এসেছো আজ
স্টালিন স্টালিন......

—অনিল কাঞ্জিলাল

স্টালিন জিন্দাবাদ

ভোরের আলোয় সূর্য তোমায় সেলাম জানালো লাল সেলাম
সারা পৃথিবীর বজ্রমুঠির লাল সেলাম
স্টালিন তোমায় লাল ঝাণ্ডার ফৌজী-নিশান তুলে
দাস জীবনের শ্রম-লাঞ্ছনা ভুলে
আমার কাব্য সেলাম জানায়
কোটি মজুরের জঙ্গী প্রাণের ভাষায়
কোটি মজুরের হাতুড়ির ঘায়
কোটি কিষাণের ধারালো কাস্তে সেলাম জানায়
স্টালিন তোমায় লাল সেলাম !

কমরেড তুমি অবতার প্রভু পয়গম্বর নও
ইংলণ্ডের শ্রমিক-মন্ত্রী, মার্কিন সভাপতি
কিংবা এদেশে নয়া রঘুপতি রাঘব রাষ্ট্রপাল !
তুমি মজুরের তুমি কিষাণের
তুমি কোটি কোটি গণ-মানবের।
দুনিয়ার যত ভুখা কলিজার বেদনার হুংকারে
স্টালিন তোমার জন্মের লালতারা
জ্বল জ্বল করে পথের নিশানা ক্ষোভের অন্ধকারে।
অযুত সর্বহারা
লাথি মারে তাই দুনিয়ার যত শোষণের কারাগারে।

বাঙলার মেয়ে সেলাম জানায় পুলিসের গুলি খেয়ে
স্বদেশী বেটনে থ্যাংলানো মাথা নিষ্পাপ কচি শিশু
ছাত্র তোমায় সেলাম জানায় রক্তমাখানো ভাষায়
ঘরে ঘরে আজ জননী ভগ্নী প্রিয়া
স্টালিন তোমায় সেলাম জানায়
কোটি মজদুর বজ্র বানায়
দানবের সাথে শেষ লড়ায়ের ইনক্লাবী ঘোষণায়।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালের রণ-হুংকার
আকাশ কাঁপায় দেরী নেই আর
রাঙা ঝড় ওঠে জনারণ্যের আলুথালু ডাল পালা
সারা দুনিয়ায় এসে গেছে আজ দিন বদলের পালা।
অযুত বুকের বেদনার খুনে
ঝাণ্ডা রাঙানো দিন গুণে গুণে
ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে আজ গণ-বন্যার বেগে—
ক্রুদ্ধ বুকের বজ্র-বিজলী চমকায় মেঘে মেঘে।

ব্যথার বারুদে প্রতিটি মজুর অজেয় মেশিনগান
কণ্ঠে তাদের শান্তির জয়গান
মিছিলে মিছিলে রক্তমশাল জ্বলে
নির্যাতনের শৃঙ্খল ছিঁড়ে মজুর-বাহিনী চলে।
আমার কবিতা তারি তালে তালে
ছন্দ বাজায় কোটি কঙ্কালে
আমার কবিতা সর্বহারার দুর্জয় ভেরী হাতে—
ললিত ভাষার ধারে নাকো ধার প্রচণ্ড সংঘাতে।
আমার কবিতা কোটি মজুরের ভাষা
ভূমি হারা যত খেতমজুরের শ্যামলী মাটির আশা
সাম্যের লাল-পাথরে শানানো জলন্ত ক্ষুরধার
ছন্দে ছন্দে ঝন্ ঝন্ করে ইনক্লাবী তলোয়ার।

সেলাম তোমায় মজুরের নেতা মজুরের সেনাপতি
নির্ভুল পরিচালনায় তুমি এনেছ অগ্রগতি
যুগ-সঞ্চিত অগ্নিগর্ভ ঝটিকার নিঃশ্বাসে
গণ-চেতনার জলন্ত বিশ্বাসে।
তাইতো তোমার প্রেম-সাধনার অমিতবীর্যে জ্বালি মশাল
তামাম দুনিয়া লালে লাল করি অগ্নি-আখরে আগামী কাল
আকাশে ওড়াই রক্ত-পতাকা
হাতুড়ি-কাস্তে শুকতারা আঁকা
তাইতো প্রতিটি মানুষের চোখে নবজীবনের স্বপ্নজাল।

(২)

দুশমনদের শেষ দুই ঘাঁটি ইংলণ্ড আমেরিকা
আসমানে শুয়ে লড়াই করার তবু দেখে মরীচিকা
যুদ্ধ-মাতাল ঘন ঘন হাঁক ছাড়ে
দোস্তালি করে মিলে মিশে যত শয়তানে বাটপাড়ে।
সারা পৃথিবীটা ওদেরি বাপের জমিদারী মনে করে
পুঁজিবাদী যত কুত্তার জিভে শোষণের লালা ঝরে,
মনে ভাবে ওরা রাজ্য চালাবে মজুরের খুন শুষে
দেশে দেশে টিটো ক্র্যাঙ্কো দালাল পুষে
বেপরোয়া যত দস্যুর দল বানায় অস্ত্রাগার
সাম্যের নামে দিনরাত করে ঘৃণ্য বিষোদ্গার
পুঁজিবাদী জানোয়ার
সর্বহারার জাগরণে ছাড়ে প্রাণভয়ে চীৎকার।

দেরী নেই আর ট্রুম্যান এট্‌লি বেভিনের শেষদিন!
ভুখা মজুরের বুকের পাঁজরে কোটি কোটি সঙ্গিন
ক্রোধের আগুনে ঝকমক করে
বিপ্লব আজ প্রতি ঘরে ঘরে
গণ-মানবের বিপুল অভ্যুদয়ে—
মিছিলে মিছিলে অযুত মশাল ছুটেছে শাস্তি জয়ে!
কত সম্রাট জার কাইজার
কত মুসোলিনী হের হিটলার
দুনিয়া জয়ের লড়াই বাধিয়ে পুড়ে হ'ল ছারখার
ধূলিতে লুটায় পাপের কেল্লা শোষণের কারাগার॥

ফাঁসির আসামী দস্যু চিয়াং মজুরের আদালতে
মহাচীন ছেড়ে গোপনে পালায় জাহান্নমের পথে
তবু শূয়োরের বাচ্চারা যত হাড়ে হাড়ে বজ্জাত
মনে ভাবে বুঝি তেস্‌রা লড়ায়ে চালাবে অস্ত্রাঘাত
অসহায় যত নরনারী শিশুবুকে
বুড়ো পৃথিবীটা ওদেরি শোষণে মরে যাবে ধুঁকে ধুঁকে।

হায়রে অলীক স্বপ্ন
যুদ্ধ-বিলাসী দুশমনদের এসে গেছে শেষ লগ্ন।
জনতার ক্রোধ আগুনের শিখা দাউ দাউ দাউ জ্বলে
কল-কারখানা জয় ক'রে বীর মজুর বাহিনী চলে
কোটি কোটি ভুখা নাঙ্গা পায়ের আওয়াজে পৃথিবী টলে
লাল ঝাণ্ডার ডাকে—
ইনক্লাব তাই আকাশে বাতাসে
বজ্রমুঠিতে হাতুড়ীর পাশে
খেতমজুরের শাণিত কাস্তে হাঁকে—
স্টালিন জিন্দাবাদ!
বস্তি ব্যারাকে চাষের মাটিতে উঠেছে সিংহনাদ॥

(৩)

কোণ ঠাসা যত শত্রুর দল ডলারের ফাঁদ পাতে
নরহত্যার স্বপ্নে মাতাল ঘুম নেই দিনে রাতে
বাটপাড় চোর বেনিয়া দস্যু শয়তান দালালেরা
দিকে দিকে ষড়যন্ত্র চালায় ভাড়াটে সৈন্য ঘেরা
স্বদেশী-শপথ ভুলে গেছে আজ শোষণের গদী পেয়ে
বেসরম হয়ে ঝুটা আজাদীর বন্দনা গান গেয়ে।
চতুর ইঙ্গ-মার্কিনীদের হাতের শেকলে বাঁধা
আজাদী খোঁটায় তবু লাফ দেয় উপনিবেশের গাধা
শিকলিতে বাঁধা জোড়া পায়ে তবু ঘন ঘন চাট মারে
ভুখা জনতার ভুখা কলিজায় শাসনের অধিকারে
মুখে জপে রাম নাম—
টাটা-বিড়লার জারজ-পুত্র স্বদেশী সত্যকাম।
চোরা কারবারে ফেঁপে ফুলে গেছে রাষ্ট্রের ফাঁপা গদী
তলে তলে তার গর্জন করে প্রলয়ের রাঙা-নদী
তক্ত-তাউসে যে কদিন আছে
মজুর কিষাণ মাথা তোলে পাছে
নিরাপত্তার স্বদেশী ডাণ্ডা চালায় ডাইনে বামে
ক্ষুধিত জনতা হুংকার ছাড়ে নগরে শহরে গ্রামে।

শাদা বেনিয়ার বুটচাটা যত পেটমোটা শয়তান
গোটা ভারতের বুক জুড়ে শুধু বানায় গোরস্থান।
প্রচারের ছুঁচো কিচ্ কিচ্ করে দৈনিক সংবাদে
বেজন্মা যত সম্পাদকের উৎকট স্তুতিবাদে—
ক্ষেপে ওঠে সারা দেশ
ধরা পড়ে যায় বেইমানদের খদ্দরে ঢাকা বেশ।

বেশি দেরী নেই তামাম ভারতে ক্রোধের আগুন জ্বলে
হিন্দুস্থান পাকিস্তানের শোষণের গদী টলে
মাটির তলায় গণ-বাসুকির ঘন ঘন নড়ে ফনা
জ্বলে পুড়ে যাবে শাসন শোষণ ছলনা প্রবঞ্চনা
গুলিতে নিহত মায়ের বোনের মাথার রুক্ষকেশ
পাকিয়ে পাকিয়ে ফাঁসির রজ্জু বানাবে জঙ্গীদেশ
গুলিতে নিহত চাষী মজুরের ছাত্রের মরা হাড়ে
বজ্র বানায়ে মজুর-বাহিনী জঙ্গী আওয়াজ ছাড়ে
শান্তির নেই দেরী
নির্যাতীতের শিবিরে শিবিরে বেজে ওঠে রণ ভেরী।
ইতিহাস জোড়া অত্যাচারের নিতে হবে প্রতিশোধ
গণ-বিচারের দিন এসে গেছে শুধু নয় প্রতিরোধ
শুধু নয় আজ মজুরির দাবি
কেড়ে নিতে হবে ভাড়ারের চাবি।
গ্রামে জনপদে ফেটে পড়ে তাই সর্বহারার ক্রোধ।

শপথ করেছি তোমার জন্মদিনে
কোটি মানুষের মুক্তির পথ চিনে
দীক্ষা নিয়েছি বিপ্লবী রণগুরু
পৃথিবীর পথে যাত্রা এবার শুরু
সর্বহারার বিপুল অভ্যুদয়ে
দুর্বার গণ-প্রগতির পরিচয়ে
স্টালিন তোমার মহান জন্মদিনে
শোষিত বুকের কোটি কোটি সঙ্গীনে
শান্তির দূত মুক্তির দূত তুমি
গণ-চেতনার মুক্ত জন্মভূমি

আমার কাব্যে ইনক্লাব হাতিয়ার।
আমার ছন্দ ঝকমকে তলোয়ার॥
কোটি কণ্ঠের তুমুল আওয়াজ তুলে।
ভীরু জীবনের মর্ম-যাতনা ভুলে॥
থর থর কাঁপে বুর্জোয়া পশুপাল।
আকাশ পৃথিবী সমুদ্র লালে লাল॥
মিছিলে মিছিলে অযুত মশাল জ্বলে।
বজ্রের শিখা জ্বলে ওঠে ধরাতলে॥
কোটি মানুষের শান্তির সাধনায়।
শান্তি-প্রহরী সোভিয়েট রুশিয়ায়

—বিমলচন্দ্র ঘোষ
২১ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

গোর্কির 'মা' ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব

—গোলাম কুদ্দুস

পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিক মাত্রেই শোষিত, কিন্তু সব শোষিত মানুষই শ্রমিক নয়। শোষিতশ্রেণীর মধ্যে খেতমজুর, গরীব কৃষক এবং নিম্ন মধ্যবিত্তও রয়েছে। নিজেদের মুক্তির জন্য এদের সকলেরই সংগ্রাম পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং তদীয় সামন্ততান্ত্রিক অনুচরবর্গের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই সংগ্রামে জয়লাভের একটাই মাত্র সুনির্দিষ্ট পথ আছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিক্ষা দিয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া এই সংগ্রামে জয়লাভের অন্য পথ নেই। শ্রমিকশ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর মত শুধু একটা শ্রেণী নয়, শ্রমিকশ্রেণী সব চাইতে প্রগতিশীল শ্রেণী, কারণ শ্রমিকশ্রেণীই একমাত্র পুরাদস্তুর বিপ্লবী শ্রেণী। ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর 'মা' উপন্যাসখানিতে শ্রমিকশ্রেণীর এই ঐতিহাসিক ভূমিকা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম তুলে ধরেন।

কি করে শ্রমিকশ্রেণী মার্কসবাদের আলোকে তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অন্যান্য শ্রেণীর উপর নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয় তাও ম্যাক্সিম গোর্কি 'মা'তেই সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ফুটিয়ে তোলেন। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কি ভাবে গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠিত হয় 'মা'তেই তা প্রথম প্রকাশ পায়। এদেশে যাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব এবং শ্রেণী-সংগ্রামকে পাকেচক্রে অগ্রাহ্য করে ধনীকৃষক, মাঝারি শিল্পপতি বা মুষ্টিমেয় তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবির সঙ্গে মিলে গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠনের ভাঁওতা দিচ্ছেন, ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' তাঁদের মুখোশ উদ্ঘাটনেরও একটা শক্তিশালী অস্ত্র। কারণ গোর্কি দেখিয়েছেন, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে খেতমজুর ও গরীব কৃষকের সঙ্গে যোগাযোগের পথেই গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গোর্কির আগে শ্রমিশ্রেণীকে নিয়ে উপন্যাস লেখা যে হয় নি তা নয়। ফরাসী হরতালি খনি মজুরদের নিয়ে লেখা এমিলি জোলার 'জার্মিনাল' বা 'অংকুর' নামে উপন্যাসখানা প্রচুর ন্যাচারালিজম সত্ত্বেও মহৎ সৃষ্টি সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সেখানে অনুপস্থিত। গোর্কির আগে

রুশিয়ার সাহিত্যে 'প্রকৃত কৃষক' দেখা গেলেও প্রকৃত শ্রমিক দেখা যায় নি
টলস্টয়ের শেষ জীবনে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী রুশিয়ার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলে
তাঁর লেখার মধ্যে তারা প্রবেশ করতে পারে নি, টলস্টয় তখন ধর্মমোহে অ
গোকির মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণী বিশ্বসাহিত্যে এসে উপস্থিত হল। যদি
তাঁর প্রথমদিকের সৃষ্টিগুলির মধ্যে ভবঘুরে জাতীয় চরিত্র যথেষ্ট স্থান পা
তবুও মজুরশ্রেণী তখন থেকেই তাঁর সাহিত্যে সবলে স্থান করে নিতে শু
করেছে। তারপর ১৯০৫ সালের বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর গৌরবময় ভূমিক
গোকির সামনে পরিষ্কার এক রাজপথ খুলে ধরল, বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী তাদে
প্রিয়তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে খুঁজে পেল।

স্টালিন তাঁর 'লেনিনবাদের ভিত্তি'তে দেখিয়েছেন, যেমন করে উনবিং
শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে জার্মানি বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠাতে
জার্মানিই বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের জন্মভূমি হয়ে দাঁড়ায় এবং মার্কস-এঙ্গেলস
তার স্রষ্টা হন, ঠিক তেমনি করে বিশ-শতকের প্রথমে রুশিয়া বিপ্লবী
আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠাতে রুশিয়াতেই সাম্রাজ্যবাদী যুগের শ্রমিক
বিপ্লবের নীতি এবং কৌশল বা থিয়োরী এবং ট্যাকটিকসের জন্ম হয় এবং
লেনিন হন তার স্রষ্টা। এই সময় সব চাইতে প্রগতিশীল সাহিত্য এবং তার
জনক হিসাবে গোর্কিকেও আমরা পাই রুশিয়ায় এবং লেনিনের পাশাপাশি
অবস্থায়। লেনিন যেমন দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষক এবং নেতা, ঠিক
তেমনি লেনিনের বিপ্লবী দীক্ষায় দীক্ষিত গোর্কি দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ
সাহিত্যিক এবং তাদের সাহিত্যিক নেতা। ভারতের প্রগতি সাহিত্যিকদের
গোর্কির কাছ থেকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাই এত বেশী।

১৯০৫ সালের বিপ্লবকে গোর্কি শুধু সাহিত্যে প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি,
প্রত্যক্ষভাবে তাতে অংশ গ্রহণও করেছিলেন। তিনি মস্কোর সশস্ত্র ডিসেম্বর
অভ্যুত্থানে যোগ দিয়েছিলেন। লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত দৈনিক 'নতুন
জীবন' নামে বলশেভিক পত্রিকারও তিনি অন্যতম সংগঠক ছিলেন। এই
তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতা গোর্কিকে শ্রমিকশ্রেণীর যুগান্তকারী উপন্যাস
'মা' লিখতে সাহায্য করেছিল। বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর গোর্কিকে বাধ্য হয়ে
দেশ ছাড়া হতে হয়। তিনি তখন বলশেভিক পার্টির তহবিলে টাকা তোলার
জন্য আমেরিকা ভ্রমণ করেন এবং সেখানে একটা সংকীর্ণ কাঠের কুঠুরীতে
বসে 'মা'র অধিকাংশভাগ রচনা করেন। 'মা' আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে

তুমুল ঝড় ওঠে রুশিয়ায়। যে পত্রিকায় 'মা'র প্রথম অংশ প্রকাশ হয় তা
বাজেয়াপ্ত করা হয়। জার সরকার গোর্কির নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের
করে—যদিও গোর্কি তখন বিদেশে।

দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা লেনিন গোর্কির উপন্যাসখানা
ছাপা হওয়ার আগেই তার পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন। লেনিনের ভাষাতেই
'মা'র ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে গোর্কি
তাঁর 'লেনিনের স্মৃতি' পুস্তকে লিখেছেন:

"তিনি (অর্থাৎ লেনিন—লেখক) অবিলম্বে আমার বই 'মা'র দোষগুলো সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন…আমি বললাম যে আমি বইটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে চেয়েছিলাম। কেন তাড়াতাড়ি শেষ করতে চেয়েছিলাম সে কথা কিন্তু বলতে পারলাম না। লেনিন আমার কথায় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। নিজেই তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, 'হুঁ, তাড়াতাড়ি করাই উচিত, ঠিক এই রকম বইয়ের দরকার আছে, কারণ অধিকাংশ শ্রমিক যারা বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছিল তারা তা অচেতনভাবেই করেছিল এবং ছিন্নভিন্নভাবে। তাদের পক্ষে 'মা' পড়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমান সময়ের আসল বই-ই হল 'মা'।"

অর্থাৎ 'মা' শুধু শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে একখানা মামুলি বই নয়। 'আর্ট ফর আর্ট সেক' বা শিল্পের জন্যই শিল্প' এই জঘন্য ভাঁওতার আড়ালে বুর্জোয়ার ভাড়াটে লেখক যারা তাদের সাহিত্যের মধ্যে বুর্জোয়া সমাজকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে ওকালতি করে তাদের ভাঁওতার বিরুদ্ধে 'মা' এক তুমুল প্রতিবাদ। 'মা' অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই 'উদ্দেশ্যমূলক' বই। এই 'উদ্দেশ্য' হল, অচেতন শ্রমিককে এবং বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য অংশকে শ্রেণী-সচেতন হতে সাহায্য করা, রুশিয়ার শ্রেণীসমাজের সমগ্র রূপ এবং সেই সমাজকে বদল করার মত বিপ্লবী সংগঠন ও গণ-আন্দোলন কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে সেটা স্পষ্ট করে চোখের সামনে তুলে ধরা। এই চেতনা লাভ করলে বিপ্লবের পথ চোখের সামনে আয়নার মত পরিষ্কার হয়, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের সঙ্গীরা দৃঢ়পদক্ষেপে বিপ্লবী পথে অগ্রসর হতে পারে, তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝরে গিয়ে বুকে প্রবল সাহস আসে, তারা নিজেদের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে বুঝতে পারে। এই শিক্ষা দেওয়া ছিল 'মা'র উদ্দেশ্য। শিক্ষা দেওয়া যে সাহিত্যের প্রধান কাজ 'মা'র ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ রয়েছে। আর 'মা'

থেকে শুধু রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী শিক্ষা পায়নি, শিক্ষা পেয়েছে সারা দুনি
শ্রমিকশ্রেণী। কারণ, আন্তর্জাতিকতা যেহেতু শ্রমিকশ্রেণীর অস্থিমজ্জা
সেই জন্য রুশিয়ার শ্রমিককে নিয়ে লেখা হলেও দুনিয়ার সব দেশের মজ
শ্রেণীই নিজেদের শ্রেষ্ঠ সংগ্রামের ছবি খুঁজে পেয়েছে 'মা'র মধ্যে।
আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর হাতে শক্তিশালী অস্ত্র হয়েছে, 'মা' পড়ে হা
হাজার মজুর বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা পেয়েছে। যে
সাহিত্যিক বুর্জোয়ার ভাড়াটে হতে চান না, বা, 'আর্ট ফর আর্ট সেক'-জা
'নিরপেক্ষতা'র মুখোশ পরে বুর্জোয়ার সেবা করতে লজ্জা পান তাঁরাও
দেশান্তরে 'মা' থেকে অনেক শিখেছেন। তাঁরা শিখেছেন কেমন করে বুর্জো
আদর্শের বিরুদ্ধে মজুরশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শ গ্রহণ করতে হয়; তা
শিখেছেন কেন মজুরশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শ ছাড়া সাহিত্য আজ
দিনে অগ্রসর হতে পারে না; তারা শিখেছেন কেন প্রগতিশীল শ্রেণীর নে
অস্বীকার করে প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টির বাসনা বাতুলতা মাত্র।

সাধারণ মজুর জনতা কিভাবে শ্রেণী-সচেতন হয় সে-সম্পর্কে লেনিনে
সুবিদিত সংজ্ঞা আছে। লেনিনের আগে রুশিয়ার 'ইকনমিস্টরা'
অর্থনীতিবাদীরা প্রচার করত যে, নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই লড়
লড়তেই নাকি মজুররা শ্রেণী-সচেতন হয়। লেনিন এই মিথ্যার মুখোশ খু
ফেলেন। তিনি বলেন, মজুর শুধু নিজের মালিক সম্পর্কে সচেতন হ
কিছু শ্রেণী-সচেতন হয় না! "রুশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশ", "'জনগণের ব
কে?" "কি করিতে হইবে" এবং "এক পা আগানো দু'পা পিছানো"
চারখানি পুস্তকে লেনিন মজুর-নেতৃত্বের কথা এবং শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শ
ও সংগঠনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। স্মরণ করা দরকার, এই বইগু
১৯০৫ সালের আগেই অর্থাৎ গোর্কির 'মা' লেখার অনেক পূর্বে লেখা হয়ে
এবং মজুর আন্দোলনের সব চাইতে বড় শত্রুর বিরুদ্ধে হেনেছিল প্রবল
আঘাত। গোর্কি সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কাজে
গোর্কি উপরোক্ত বইগুলো থেকে নিশ্চয়ই প্রচুর শিক্ষা পেয়েছিলেন
তার প্রমাণ 'মা'র ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। গোর্কি যে লেনিনের শিক্ষা মনেপ্রা
গ্রহণ করেছিলেন তার সব চাইতে বড় প্রমাণ 'মা'র মধ্যেকার রু
চরিত্রগুলি। লেনিনের 'গ্রামের গরীবদের প্রতি' বইটা রচিত হয় ১৯
সালে। এ সম্পর্কে পরে বলা যাবে।

কি করে একজন সাধারণ মজুরকে শ্রেণী-সচেতন করা যায় সে-সম্পর্কে
নিনের সুবিদিত সংজ্ঞাটি হল এই:

জুর জনতার চেতনা প্রকৃত শ্রেণী-চেতনা হতে পারে না, যদি মজুরেরা বাস্তব এবং বিশেষত চলতি রাজনৈতিক তথ্য এবং ঘটনা, **প্রত্যেকটি** অন্যান্য সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কে এবং ঐ সব শ্রেণীর বুদ্ধি, নীতি এবং রাজনৈতিক জীবনের **সমস্ত** প্রকাশ সম্পর্কে দেখতে না শেখে; যদি তারা জনতার সমস্ত শ্রেণী, স্তর এবং গ্রুপের লোকদের জীবন এবং ক্রিয়াকর্মের **সমস্ত** দিকগুলো সম্পর্কে কার্যক্ষেত্রে বস্তুবাদী বিশ্লেষণ এবং বস্তুবাদী হিসাব কসতে না জানে।···একজন মজুরকে সোশাল ডেমোক্রাট হতে হলে জমিদার, পীর-পুরোহিত, বড় বড় সরকারী আমলা, ছাত্র এবং ভবঘুরে লোকদের অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিকগুলো সম্পর্কে মনের মধ্যে একটা পরিষ্কার ছবি থাকা চাই। এদের শক্তি এবং দুর্বলতার দিকগুলো তার জানা থাকা চাই। এই সব প্রত্যেকটি শ্রেণী এবং স্তরের লোক কি কি বুলি এবং বাগাড়ম্বরের আড়ালে নিজেদের স্বার্থপর অভিসন্ধি এবং প্রকৃত 'চরিত্র' **ঢেকে** রাখে তা তার বোঝা চাই। তাকে আরও বোঝা চাই, বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান এবং আইনগুলি ওদের স্বার্থের সঙ্গে কিভাবে জড়িত এবং কিভাবে তা প্রকাশ পাচ্ছে। এই 'পরিষ্কার' ছবি বই থেকে পাওয়া যায় না। জীবন্ত উদাহরণ থেকে এবং ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তার রহস্য-ফাঁসের মধ্য দিয়ে, বিশেষ সময়ে আমাদের চারপাশে যা ঘটছে যা আলোচিত হচ্ছে যা ফিসফাসের মত চলছে তার মধ্য দিয়ে এবং অমুক অমুক ঘটনা অমুক অমুক আদালতের বিচার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তার মনের ছবি পরিষ্কার হতে পারে। জনতাকে বিপ্লবী কর্মে দীক্ষা দিতে হলে এই রকম সার্বজনীন রাজনৈতিক মুখোশ খুলে দেওয়ার কাজ জরুরী এবং **একেবারে গোড়ার** কথা।"

[সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১৯৭ পৃঃ]

এই শ্রেণী-চেতনা সাহিত্যের মারফত জাগ্রত করতে সাহায্য করার জন্যই গোর্কি 'মা' লিখেছিলেন। গোর্কি তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার আলোকে বুঝেছিলেন যে, লেনিনের শিক্ষা সামাজিক বাস্তবতাকে গভীরতমভাবে প্রকাশ করার এক সীমাহীন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। লেনিন দেখিয়েছেন, বাস্তবকে

একপেশেভাবে দেখানোর পরিবর্তে কি করে বিপ্লবী-শ্রেণীর দৃষ্টিতে সর্বাঙ্গীনভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

কিন্তু একথা বললে তাহা মিথ্যা বলা হবে যে, গোর্কি বুঝি এই উদ্দে সাধনের জন্য ছক কেটে কেটে কতকগুলো কাল্পনিক অবাস্তব চরিত্র নি একখানা উপন্যাস লিখেছেন। উদ্দেশ্য তাতে মোটেই সিদ্ধ হয় না। জীব বাস্তবের উর্দ্ধে ওঠার প্রয়োজন হয়নি গোর্কির, কারণ গোর্কিকে কল্পনা আকাশে শ্রেণী-চেতনার উপাদান খুঁজতে হয়নি। গোর্কি অগ্রগামী শ্রেণ অগ্রগামী চরিত্রদের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলেছেন অসাধারণ প্রতিভা আলোকে।

যে আদর্শের জন্য 'মা'র চরিত্রগুলো লড়াই শুরু করেছিল তা 'মা' লেখা দশ বৎসর পরে সোভিয়েট বিপ্লবের মধ্যে বাস্তবে পরিণত হয়। চরিত্রগুলোকে 'মা'র পাতায় পাতায় গোর্কি অমর করে তুলেছিলেন তাদে কয়েকজন এখনও জীবিত আছেন সোভিয়েট ইউনিয়নে এবং তাঁরা সেখানে নিজেদের হাতে সমাজতান্ত্রিক সমাজকে গড়ে তুলেছেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ইতিহাসের অগ্রগতির এমন মিল একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদে আলোকিত শ্রেণী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ সাহিত্যিকের লেখাতেই সম্ভব। এইরকম লেখা শুধু ঐতিহাসিক গতির ছবিই আঁকে না, ইতিহাসের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতেও সাহায্য করে। সেইজন্য এইরকম লেখার শক্তি এত প্রচণ্ড এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা এত বেশী। সেইজন্যই লেনিন বলেছিলেন, "বর্তমান সময়ের আসল বই-ই হল 'মা'।"

(২)

বইয়ের প্রধান চরিত্র প্যাভেল এবং তার মা। প্যাভেল যে জাত মজুর তাতে গোর্কি বিন্দুমাত্র সন্দেহ রাখেননি। শ্রমিক বাপের শ্রমিক ছেলে সে। এই প্যাভেল এবং বিশেষ করে তার মায়ের বিপ্লবী পরিবর্তন হল 'মা' উপন্যাসের প্রধান বিষয়। কিন্তু এ শুধু ব্যক্তিগত পরিবর্তনের কথা নয়। এই পরিবর্তন মজুর এবং কৃষকের তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত। মজুর শ্রেণীর মধ্যে ও মজুরের নেতৃত্বে কৃষকের মধ্যে নির্মম শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে যে কি আমূল পরিবর্তনের ঝড়, ঐক্যের জোয়ার এবং নতুন মানুষের জন্ম হচ্ছে সেটা প্রচণ্ডভাবে ফুটে বেরিয়েছে 'মা'র পাতায় পাতায়।

বইয়ের শুরুতে গোর্কি সাধারণ শ্রমিকের ছবি আঁকছেন এইভাবে :

"মেহনতে এলিয়ে-পড়া মানুষগুলো ঢকঢক করে মদ খায় এবং তাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে একটা দুর্দান্ত খিটখিটে ভাব জেগে ওঠে এবং তা বেড়ে চলে। এই ভাব বাইরে প্রকাশ হওয়ার একটা পথ খোঁজে। এই অস্থির ভাব বুকের থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য তারা যে কোনো তুচ্ছ ছলনায় জন্তুর মত হিংস্র হয়ে পরস্পরের সঙ্গে রক্তারক্তি ঝগড়া করে, কোনো সময় হয়ত এতে কেউ ভীষণ খুঁতো হয়ে যায়, কোন সময় হয়ত মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে···তাদের আত্মার এই ব্যারাম তারা বাপ-দাদাদের কাছ থেকে পেয়ে এসেছে। ঘোর কালো ছায়ার মত এই ভাব তাদের মনে মৃত্যু পর্যন্ত ধাওয়া করে, কত নিষ্ঠুরতা করায় তাদের দিয়ে। উদ্দেশ্যহীন নিষ্ঠুরতা এবং বর্বরতার জন্য একে আরও ভয়াবহ মনে হয়।···মনে হয় তাদের কারোরই এই ধরনের জীবন-ধারা পরিবর্তন করার মত সময় বা ইচ্ছা নেই।"

মালিকের নিষ্ঠুর শোষণের তলায় মজুরেরা যে নিজেদের মধ্যে নিষ্ঠুর, হিংসাদ্বেষ এবং নীচতার পরিচয় দেয় এবং জন্তুর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় গোর্কি সেখান থেকেই শুরু করেছেন। গোর্কি সেটা চেপে ঢেকে রাখেন নি, গোর্কির চরিত্র বর্ণহীন নয়, জীবন্ত মানুষ। কিন্তু গোর্কির বিষয়বস্তু হল—এই মজুর শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কি করে প্রচণ্ড মানবিকতা বা মিলিট্যাণ্ট হিউম্যানিজমের পথে অগ্রসর হয়। এই মজুরেরা প্রথমে পরিবর্তনকে কিভাবে দেখত? গোর্কি লিখছেন :

"কোনো কিছুতে কোনো ভাল হবে এই আশা না থাকায় তারা যে কোন পরিবর্তনকে ঘাড়ের উপর আরও কিছু বোঝা চাপছে বলে মনে করত।"

প্যাভেলের বাপ ছিল ঠিক এই ধরনের শ্রমিক। বাপের মৃত্যুর পর কিশোর প্যাভেলও বাপের মতই মদ খেয়ে এল। মায়ের তিরস্কারে বলল, "সবাই তো খায়।" প্যাভেলের জীবনযাত্রাও তার বাপের মতই গতানুগতিক খাতে চলতে শুরু হত, সেও অমানুষ নিষ্ঠুর হতে শুরু করত। যদি না—যদি না এই সময় তার দেখা হত একজন বিপ্লবী মজুরের সঙ্গে এবং সে যদি না শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে এসে পড়ত। গোর্কি লিখছেন, "প্যাভেল বাড়ীতে বই আনতে শুরু করল···সন্ধ্যার পর দিনের কাজের শেষে গা হাত পা ধুয়ে খেতে বসত। তার পরই বইগুলোর উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং

বহুক্ষণ ধরে পড়াশুনা করত।··· মা'র মনে হতে লাগল, যতই দিন যাচ্ছে ততই তার কথাবার্তা কমে আসছে, আর সে কথা বললে তার মধ্যে প্রায়ই এমন সব শব্দ বেরুতে শুরু করল যা মায়ের কাছে দুর্বোধ্য। প্যাভেলের কথাবার্তার মধ্যেকার কড়া রুক্ষ এবং গালাগালিওয়ালা জিনিসগুলো ঝরে গেল।"

অর্থাৎ বিপ্লবী রাজনীতির ছোঁয়া লেগে প্যাভেল ইতিমধ্যেই নতুন মানুষ হতে শুরু করেছে। দু'বছর এইভাবে কেটে গেল। ঔৎসুক্য চাপতে না পেরে মা একদিন জিজ্ঞাসা করে, "কী তুই সারাদিন পড়িস?"

"এতে আমাদের মজুরদের জীবনের কথা লেখা আছে···আমাকে জেলে পুরবে কারণ আমি সত্যকে জানতে চাই।

"মার পক্ষে হঠাৎ বিশ্বাস টানা শক্ত হয়ে ওঠে। চোখ তুলে মা তার ছেলের দিকে চেয়ে থাকে, তাকে যেন এক নতুন মানুষ এবং যেন একজন অপরিচিত লোক বলে মনে হতে লাগল।

"মা জিজ্ঞাসা করল, কেন এগুলো পড়?"

"আমি সত্যকে জানতে চাই।"

কি যেন একটা ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে মনে করে মা হঠাৎ কেঁদে ফেলে। প্যাভেল বলে, "কেঁদ না, ভেবে দেখ তুমি কি ধরনের জীবন কাটিয়েছ···চল্লিশ বছর তোমার বয়স হল, কিন্তু একে কি বাঁচা বলে? বাবা তোমাকে ধরে ধ'রে মেরেছে, অথচ সে জানত না কেন তোমাকে সে মারছে!··· কারখানা বেড়ে যাচ্ছে···আর তার জন্য খেটে খেটে লোক মরছে।" প্যাভেল আরও অনেক কথা বলল, মা তার সবটা বুঝল না, তবে মায়ের সম্পর্কে প্যাভেল যা বলল তা মায়ের কাছে খুবই সত্য মনে হল, কাজেই প্যাভেলের সব কথাই মায়ের কাছে সত্য বলে মনে হল। মা জিজ্ঞাসা করল, "তা হলে কি করতে চাও?"

"পড়তে চাই এবং তারপর অন্যকে শিখাতে চাই। আমাদের মজুরদের নিশ্চয়ই পড়তে হবে। আমাদের শিখতে হবে। আমাদের জানতে হবে— কেন জীবনটা আমাদের কাছে এত কঠিন।"

'মা' বইখানার মধ্যে বারে বারে বই পড়া, কাগজ পড়া এবং সত্যকে জানার চেষ্টার উল্লেখ আছে। বারে বারে প্যাভেল এবং অন্যান্য মজুররা বই পড়ছে, শিখছে এবং তর্ক করছে। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ফলে সাম্যবাদী চিন্তা যে আসে না, সেটা বুঝতে হলে যে বই থেকে পড়ে পড়ে বা শুনে শুনে থিয়োরী

আয়ত্ত করতে হয় 'মা'র মধ্যে বারে বারে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে গোর্কি দেখিয়েছেন। প্যাভেল সেই শ্রেণীর মজুর যাদের বলা হয় অগ্রগামী মজুর। প্যাভেল এক জায়গায় বলছে, "শত্রুদেরকে আমাদের দেখাতে হবে যে, তারা যে-দাসত্ব এবং অমানুষিক পরিশ্রম আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তা সত্ত্বেও বুদ্ধির ব্যাপারে আমরা তাদের উপরে তাল ঠুকে কথা বলতে পারি এবং মানসিক দিক থেকে আমরা তাদের থেকে অনেক অনেক উঁচুতে।" এই রকম রাজনৈতিক শ্রেণী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ মজুরকে সাহিত্যে সর্বপ্রধান স্থান ছেড়ে দিতে তাই বোধ করি বুর্জোয়া সমালোচকদের এত আপত্তি!

শুধু মজুর নয়, কৃষকের ভিতর যারা অগ্রগামী তাদের মধ্যেও কিভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের টানে বইপড়ার ইচ্ছাটা জেগে ওঠে গোর্কি তাও দেখিয়েছেন। গ্রামের খেতমজুর ইয়াফিম শহরে এসে উপস্থিত হয় বইয়ের সন্ধানে, প্যাভেলের বইগুলো সে নাড়াচাড়া শুরু করে এবং তারপর বলে, "তোমাদের তুলনায় গ্রামে বইপড়ার সময়টা আমরা বেশী পাই।"

প্যাভেল বলে, "কিন্তু পড়ার ইচ্ছাটা তোমাদের কম।"

ইয়াফিম উত্তর দেয়, "সময়টা এমন যে, হয় চিন্তা করো না হয় তো শুয়ে শুয়ে মরো। কিন্তু মানুষ মরতে চায় না।"

বইগুলো কি ধরনের হওয়া দরকার এবং তার ভাষা কেমন হবে? রাইবিনের মুখ দিয়ে গোর্কি বলাচ্ছেন, "আমাকে বই দাও, এমন বই দাও যা পড়লে মানুষ চুপচাপ বসে থাকতে পারবে না। তার মাথার মধ্যে যেন জলন্ত পেরেকের মত ঢোকে। তোমাদের শহরের লোকদের বল, তারা যেন গ্রামের জন্যও লেখে। এমন জীবন্ত সত্য তারা লিখুক, যাতে গ্রামগুলো পাগল হয়ে যাবে, যাতে লোক মৃত্যুর দিকে ছুটে যাবে!" এরপর রাইবিন চিৎকার করে ওঠে, "যত সহজ করে পার তত সহজ করে লেখ, এমন সহজ যা পড়লে গরুর বাছুর পর্যন্ত বুঝতে পারে।" আমাদের বাংলার বিপ্লবী সাহিত্যিকদের এ থেকে নিশ্চয়ই শিক্ষা নেওয়ার আছে।

ইতিমধ্যে প্যাভেল এবং তার কমরেডদের সংস্পর্শে এসে মা'ও পরিবর্তিত হতে শুরু করে। মা তার নিজের পরিবর্তনকে লক্ষ্য না করে বরং প্যাভেলকে বলে, "মজুররা পরস্পরকে নিজেরা এত ঘৃণা করে! তারা লোভ এবং হিংসার মধ্যে বাস করে! পরস্পরকে ক্ষতি করতে পারলে তারা এত খুশী! তারা শুধু মজা দেখার জন্য পরস্পরে এত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।"

কিছুদিন পরে মা এই পুরাতন বাস্তবের পাশাপাশি এক নতুন বাস্তবের উদয়কে লক্ষ্য করে। তখন ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘট হয়ে গেছে, মে'ডেতে প্যাভেল প্রভৃতি গ্রেপ্তার হয়েছে, সাধারণ মজুরের মধ্যে আন্দোলনের প্রসার এবং মালিক-পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ বেড়ে গেছে অর্থাৎ এক কথায় ফ্যাক্টরীর মজুরেরা তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে নেমে পড়েছে। এমন সময় একদিন মা কৌশলে ইস্তাহার নিয়ে আসে ফ্যাক্টরীর মধ্যে। এতে মজুরদের মধ্যে জাগে প্রচণ্ড সাড়া। হঠাৎ মার মনে হয়, "যেন মজুরদের সকলের ময়লা ধুয়ে মুছে গেছে, তারা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।"

শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মজুরদের আগেকার নিজেদের সেই নিষ্ঠুরতা বিদ্বেষ কেটে গিয়ে কিভাবে তাদের মধ্যে নতুন মনুষ্যত্ব জন্মলাভ করে গোর্কি অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে তা প্রকাশ করেছেন। শ্রেণী-সংগ্রাম তাদের পরস্পরের হিংসাদ্বেষ মুছে দিয়ে দিয়ে যেন ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্কের মধ্যে কোমল মাধুর্যের ছায়া ফেলতে শুরু করে। অর্থাৎ একমাত্র শ্রেণী-সংগ্রামের ফলেই মজুর এবং গরীব জনতার মনে মানবতাবোধ প্রচণ্ডভাবে জেগে উঠতে পারে। 'মা'র পাতায় পাতায় এবং গোর্কির সমগ্র রচনায় শ্রেণী-সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক সত্যই বারবার হাজার বার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অথচ 'হিউম্যানিস্টের' ভেক ধারণ করে বুর্জোয়ার মাথামোটা ভাড়াটে দালাল এই সত্যকে ফাঁকি দিতে চায়। 'নিউ হিউম্যানিস্ট' (!) এবং মার্কিন দালাল এম-এন রায় এবং তদীয় শিষ্য আবু সয়ীদ আইয়ুব ও তস্য শিষ্য প্রশিষ্যরা মজুরের ক্ষমতা দখলের লড়াইকে শুধু ভাত ডালের লড়াই বলে প্রচার করছে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে গণতন্ত্রের নমুনা বলে দু'পয়সা রোজগার করছে, আর শতকরা ৯৫ জন মেহনতী মানুষের নব জাগ্রত মানবতার মাথায় জুতো মারার স্পর্ধা দেখাচ্ছে। যে মজুরেরা নিজেদের একতা সৃষ্টি করে মালিকের বিরুদ্ধে দুর্জয় সাহসের সঙ্গে লড়ছে এবং যে খেতমজুর-কৃষকেরা জমিদার-জোতদারের তোয়াক্কা না করে যুগযুগান্তের পরাধীনতাকে লাথি মেরে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তাদের মনে নতুন মর্যাদা বোধ, নতুন আত্মসম্মান বোধ এবং নতুন মনুষ্যত্ব জাগবে না তো জাগবে কি দালালদের বিভৎস গলিত মস্তিষ্কের মধ্যে? তাই শ্রেণী-সংগ্রাম দেশের কোণায় কোণায় শতকরা ৯৫ জনের মানসিক উন্নতি বাড়িয়ে দেয় প্রচণ্ড পরিমাণে। এই নবজাগ্রত মনুষ্যত্ব এবং মানসিক উন্নতিই দেশের সংস্কৃতির প্রাণ এবং উৎস। একমাত্র এই উৎসের উপর নির্ভর করেই

...ANI SEN GRANTHAGAR O GABESANA KENDRA

বড় শিল্প বড় সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। যেমন সৃষ্টি হয়েছে 'মা'। শ্রেণী-সংগ্রামকে বাদ দিয়ে যারা জীবনে দালালিই সার করেছে তাদের তো আত্মাকে বিক্রী করে দেওয়াই পেশা। তাদের সংস্কৃতি তাই ঘাড় হেঁট করা সংস্কৃতি অর্থাৎ কুকুরের প্রভুভক্তির সংস্কৃতি।

শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে যে নতুন মানুষ জন্ম নেয় তার হৃদয়ে যে কি বিরাট সংস্কৃতি জেগে ওঠে মর্মস্পর্শীভাষায় গোর্কি তার ঝলক দেখিয়েছেন: ইউক্রেনিয়ান মজুর আঁদ্রে বলছে, "লোকের ভাগ্যে এখনও অনেক যন্ত্রণা আছে, লোভীদের চক্রান্তে তাদের অনেক রক্তে এখনও মাটি ভিজে লাল হবে, কিন্তু **ইতিমধ্যে** আমার বুকের মধ্যে, আমার মনের মধ্যে, আমার হাড়ে হাড়ে যে জিনিস জেগে উঠছে তার তুলনায় আমার যন্ত্রণা, আমার রক্তপাত কিছুই না। আমি **ইতিমধ্যেই** ধনী হয়ে উঠেছি—আকাশের তারার মত। আমি সব কিছু সহ্য করব, আমি সব যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাব, কারণ আমার মনের মধ্যে এমন এক আনন্দ আছে যা কিছুতেই কেউ দমাতে পারবে না। এই আনন্দের মধ্যেই বিশ্বশক্তি লুকিয়ে আছে।" পাঠকেরা প্রথমে লক্ষ্য করুন 'ইতিমধ্যেই' শব্দটা এবং দ্বিতীয়ত আনন্দের কথাটা। বুর্জোয়ার ভাড়াটে সাহিত্যিক ও দালাল যারা জীবনে এত প্রাচুর্যভোগ করে, তারা যখন নৈরাশ্যের পাঁকে তলিয়ে যায় তখন একজন বুভুক্ষু শ্রেণী-সচেতন সাহিত্যিক আনন্দের গান গায়। জুলিয়াস ফুচিকও মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে এই আনন্দের কথাই বলেছিলেন। এই নতুন আনন্দের ঢেউ প্রৌঢ়া মায়ের মনকে এমনভাবে ঝাড়িয়ে দিয়ে গেল যে, মা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নতুন করে অ আ ক খ লেখাপড়া শিখতে শুরু করল, যাতে কিনা বই পড়তে পারা যায়! পাছে অন্য কেউ দেখে ফেলে তাই মা রান্নাঘরের মধ্যে বসে চুপিচুপি চোখের অনেক জল ঝরিয়ে লেখাপড়া শিখতে শুরু করল। এ রকম ঘটনা ভারতের মাটিতেও অসংখ্য ঘটতে দেখা যাচ্ছে। শ্রেণী-সংগ্রামের উদ্দাম টানে সংস্কৃতি এবং মানবতার এই জয়যাত্রা দেখার মত চোখ এবং বুদ্ধি আবু সয়ীদ আইয়ুবদের নেই—কারণ সেগুলো তারা বুর্জোয়ার কাছে বাঁধা দিয়েছে। চোখে তাদের ছানি পড়েছে, আর মগজ তাদের পচে গেছে। এদের সম্পর্কে গোর্কি 'সংস্কৃতি এবং জনগণ'-পুস্তকে বলেছিলেন, "মাছ যেমন মাথা থেকে পচতে শুরু করে তেমনি বুর্জোয়া সভ্যতার পচন শুরু হয় মাথা থেকে।" এদের মাথা যদি পচে গোবর না হয়ে যেত তাহলে এরা দেখতে পেত, শ্রমিক আন্দোলনকে

শুধুমাত্র রুটির লড়াইয়ের মধ্যে আটকে রাখার চেষ্টা করে কারা ? আই-এন-টি-ইউ-সি এবং সোশালিস্ট মার্কা দালালরা। তারা আবু সয়ীদ আইয়ুবদের মতই দেশী-বিদেশী বুর্জোয়ার দালাল—অবশ্য রুটির লড়াইয়ের কথাটাও এরা বেইমানি ঢেকে রাখার মুখোশ হিসাবে ব্যবহার করে। মাথা যদি এদের পচে না যেত তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার মহত্তম স্বাধীনতার সংগ্রামকে ব্যঙ্গ করার আস্পর্ধা তাদের হত না। অবশ্য এদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, কারণ এরা বুর্জোয়ার ভাড়াটে মিথ্যুক, মানুষের মত এদের চেহারা হলেও এরা পশুর অধম, এরা আজ বর্বর নররাক্ষসের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ভারতেও আজ ফ্যাক্টরী ফ্যাক্টরীতে, গ্রামে গ্রামে প্রচণ্ড শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে নতুন সংস্কৃতি জন্ম নিচ্ছে, কারণ আত্মমর্যাদায় দৃপ্ত নতুন মনুষ্যত্ব এবং নতুন মানুষ জেগে উঠছে। শ্রেণী-সংগ্রামই এই সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে, গুটি কয়েক মানুষের সাহিত্য নয়। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের সহায়ক হয়ে এবং শ্রেণী-সংগ্রামের বিপ্লবী প্রতিফলন করে যে-সাহিত্য জন্ম নেবে, তাও আবার জনতার সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। গোর্কি 'মা' লিখে সেই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এই যে নতুন সংস্কৃতি প্রকৃত দেশপ্রেমই তার প্রাণ। কিন্তু সে সংস্কৃতি আবার আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিও বটে—যেমন আন্তর্জাতিকতা শ্রেষ্ঠতম বুর্জোয়া লেখকও তাদের বিপ্লবীযুগে কোনদিন স্বপ্নেও প্রতিফলিত করতে পারেনি, কারণ আন্তর্জাতিকতা শ্রমিকশ্রেণীর একান্ত আপনার জিনিস। এই আন্তর্জাতিকতা 'মা' বইয়ের প্রাণকেন্দ্র। মার জীবনে যে-শ্রমিকটি সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করল সেই আঁদ্রে রুশিয়ান নয়, ইউক্রেনিয়ান। ১৯০২ সালের আন্তর্জাতিকতার যে চিত্র গোর্কি এঁকেছেন বিশ্বসাহিত্যে—তা আজ পর্যন্ত অদ্বিতীয়। মা নিজে প্রথম প্রথম এই আন্তর্জাতিকতা বুঝে উঠতে পারত না। গোর্কি লিখছেন:

"মাঝে মাঝে মা এদের নিদারুণ আকস্মিক আনন্দ দেখে অবাক হত…এদের এই সব আনন্দ ফুটে বেরুত সেই সবদিন যেদিন এরা কাগজে অন্যান্য দেশের মজুর সম্পর্কে পড়ত, তখন তাদের চোখগুলো সাহসে জ্বলজ্বল করত, আনন্দে নেচে উঠত, তারা শিশুদের মত আশ্চর্যরকম সুখী হত, ঘর তাদের আনন্দের হাসিতে ভরে যেত, একজন আর একজনের কাঁধে সস্নেহে

চাপড় মারত। কেউ আনন্দে চিৎকার করে উঠত 'আমাদের ফরাসী কমরেডরা দারুণ লোক', অথবা কেউ চেঁচিয়ে উঠত, ইতালির মজুর কমরেড জিন্দাবাদ'…সারা বিশ্বের শ্রমিকদের আত্মীয়তায় ঘরখানি ভরে উঠত।"

এইসব দেখে শুনে মা একদিন ইউক্রেনিয়ান আঁদ্রেকে বলেই ফেলল, "কি আশ্চর্য লোক তোমরা! সবাই তোমাদের কমরেড! আর্মেনিয়ান, ইহুদি, অস্ট্রিয়ান—সবাই!"

ইউক্রেনিয়ান জবাব দেয়, "সবাই, মাগো সবাই! মাগো দুনিয়াটা আমাদের! আমাদের মজুরদের জন্যই দুনিয়াটা! আমাদের কোনো জাত নেই, জাতি নেই। আমাদের জন্য আছে কেবল দোস্ত আর দুশমন। সমস্ত মজুর আমাদের দোস্ত, আমাদের কমরেড; আর সমস্ত বড়লোক, সমস্ত শাসক আমাদের শত্রু। এই চেতনা বেড়ে যাচ্ছে, এই চেতনা সূর্যের মত আমাদের মনে উত্তাপ দিচ্ছে। ন্যায়ের স্বর্গে এ এক দ্বিতীয় সূর্য। এই সূর্য আমাদের মজুরদের মনের মধ্যে রয়েছে।"

এমনি ধরনের আলাপ-আলোচনা এবং বিভিন্ন শ্রেণী-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে মার পরিবর্তন এমন দ্রুততালে হতে থাকে যে, প্যাভেলের গ্রেপ্তারের পর মা যখন প্যাভেলের এক কমরেড নিকোলের বাড়িতে আশ্রয় পেল তখন মা আর সরাসরি রাজনীতি না করে চুপ করে বসে থাকতে পারছে না। মা 'কাজ' চায়। এই 'কাজ' শব্দটার মানে নিকোলে প্রথম ধরতে পারেনি। তাই নিকোলে বলল, "আমার ঘর গেরস্থালির কাজ সামান্য, আমি অবিবাহিত—"

মা শান্তভাবে বলে, "আমি তার কথা বলছি না—আমি ঘর গেরস্থালির কাজের কথা বলছি না। আমি বলছি বিশ্বের কাজ।"

বিশ্বের কাজ, ওয়ার্লড্ ওয়ার্ক! ভাড়াটে লেখকদের সাধ্য কি শতজন্মের সাধনাতেও এত বড় উঁচু পর্যায়ে উঠে। অথচ যার জীবনের চল্লিশটা বছর কেটেছে ক্ষুদ্রতম বর্বরতম একটা সংসারের মধ্যে তেমনি একজন শ্রমিক-জননী শ্রেণী-চেতনার স্পর্শে কোন পর্যায়ে উন্নীত হল তা যাদের চোখে একদম ছানি পড়েনি তারা চেয়ে দেখুক। চেয়ে দেখুক জাতীয়তাবাদের পংকে নিমজ্জিত গান্ধিবাদী তারাশঙ্কর। চেয়ে দেখুক সেই মিথ্যেবাদীর দল যারা বলে কতকগুলো কমিউনিস্ট শুধু ডাল রুটির জন্য উস্কাচ্ছে! চেয়ে দেখুক, মজুরশ্রেণী কেমন করে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মাথায় লাথি মেরে

আন্তর্জাতিকতার পথে অগ্রসর হয়। এ রবীন্দ্রনাথের বুর্জোয়া 'বিশ্বপ্রেম' নয়, এই আন্তর্জাতিকতা বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীবুর্জোয়ার বিরুদ্ধে এক ক্ষুরধার হাতিয়ার। প্রত্যেক দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অন্তবিরোধ তাদের কাঁটার মত বিদ্ধ করে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর কোনো অন্তবিরোধ নেই। তাই ভারতের মজুরশ্রেণীকে সোভিয়েট প্রেরণা দেয়, তাই নয়াগণতন্ত্র এবং বিশ্বের দেশে দেশে মজুর আন্দোলন তাদের এত উৎসাহ জোগায়, তাই মহাচীনে মজুরশ্রেণার জয়যাত্রা তাদের সম্মুখে এগোবার শক্তির উৎস দেয় খুলে, তাই চীনের শ্রমিকের জয়যাত্রা সারা ভারতে মজুরের নেতৃত্বে মেহনতী মানুষের মধ্যে এত উচ্ছ্বাস জেগে উঠেছে।

শ্রমিকশ্রেণী তার জয়ের জন্য যেমন নতুন মানবতা, নিজেদের মধ্যে ঐক্য এবং আন্তর্জাতিকতা গড়ে তোলে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের নেতৃত্বে এক বিরাট গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট তৈরী করে। এই গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের রূপও দেখিয়েছেন গোর্কি। এখানেও গোর্কির শিক্ষক লেনিন। প্লেখানভ প্রভৃতি কৃষকের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠনের কথা মানেন নি, ট্রটস্কির বিশ্বাসঘাতকতার ধারাও ঐ পথেই গিয়েছে। যখন তারা কৃষকের কথা বলেছে তখন অবশ্য তা ঐ ধনীকৃষককে রক্ষার জন্যই, ঠিক টিটোর কায়দায়। লেনিনের গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের আসল ভিত্তি হল, শ্রমিকের নেতৃত্বে খেতমজুর এবং গরীব কৃষক।

'মা'র প্রথমদিকে দেখান হয়েছে শহরের মজুরদের শ্রেণী-সংগ্রাম দেখে তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কি করে জনৈক মজুর রাইবিন স্বতস্ফূর্তভাবে কাজ করতে ছুটে গেল গ্রামে। তারপর দেখান হয়েছে, কি করে এই স্বতস্ফূর্ততা মজুরশ্রেণীর নেতৃত্বে সাংগঠনিক রূপ নিতে শুরু করল। প্রথমদিকে প্যাভেলের কৃষকদের উপর কিছুটা সন্দেহ ছিল। গোর্কি লিখছেন:

"মা তাদের তর্কবিতর্ক শুনছিল এবং শুনে মা বুঝল যে, প্যাভেল কৃষকদের বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না, কিন্তু আঁদ্রে কৃষকদের পক্ষে আছে এবং সে দেখাতে চেষ্টা করছে যে, কৃষকরাও যাতে ভাল জিনিসটা বুঝতে পারে সেই মত তাদের শিক্ষা দিতে হবে।" এর কিছুকাল পরে যখন প্যাভেল কৃষকদের জন্য খবরের কাগজের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে ঘোষণা করল তখন মা "হাসিমুখে তার ছেলের দিকে চাইল এবং সম্মতিসূচক ঘাড় ঝাঁকাল।" কাজ শুরু করার পর মা গ্রামে কাগজপত্র নিয়ে যেতে শুরু করল। মা প্রথমবার গ্রামে যাদের কাছে গেল সে পূর্বেকার সেই পুরাতন মজুর বন্ধু

রাইবিন—যে লোকটি মজুরদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামে আন্দোলনের জন্য গিয়েছিল। রাইবিন আলকাতরার গুদামে কাজ করে। রাইবিনের সঙ্গে রয়েছে আর তিনজন—ইয়াকভ, ইগনাটি এবং ইয়াফিম। এরা সবাই গ্রামের শ্রমিক। দ্বিতীয়বার যাদের সঙ্গে মার যোগাযোগ হয় তাদের মধ্যে রয়েছে খেতমজুর এবং গরীব কৃষক—টেফান, পায়টর এবং তাতিয়ানা। খেতমজুর ও গরীব কৃষকের উপর শ্রমিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথেই গোর্কি ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্টের নির্দেশ দিয়েছেন। তার সঙ্গে ছাত্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রভৃতি আছে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা যে মোটেই গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের অন্যতম ভিত্তি হতে পারে না একথা আমাদের বিপ্লবী সাহিত্যিকগণ যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন ততই মঙ্গল। অশিক্ষিত লোকের মাথায় সহজে কোন কিছু ঢোকে না বলে যে সব মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবী উন্নাসিকতা প্রকাশ করে—গোর্কি গ্রামের মজুরের মুখ দিয়ে তারও জবাব দিয়েছেন। ভূমিহীন খেতমজুর পায়টর বলছে, "এমন উদাহরণ আছে যারা লিখতে পড়তে জানে না অথচ অনেক ভাল বোঝে শিক্ষিত লোকের চাইতে—বিশেষত সেই সব শিক্ষিত লোকের পেট যদি ভর্তি থাকে।"

অবশ্য গ্রামে গেলেই গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠিত হয় না। আচার্য প্রফুল্ল রায় এবং কংগ্রেস চিরকাল বলে এসেছে, "গ্রামে যাও, গ্রামে যাও, ব্যাক্ টু ভিলেজ" ইত্যাদি। সে গ্রামে যাওয়ার অর্থ জোতদার-জমিদার-ধনীকৃষকের সঙ্গে সমঝোতা করা, মহব্বত করা। গ্রামে যেতে নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু মজুরশ্রেণীর নেতৃত্ব নিয়ে গ্রামে যেতে হবে। যদি তা না হত তাহলে রুশিয়ার নারদনিক এবং সোশালিস্ট-রেভোলিউশনিস্টরাও গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠন করতে পারত। বরং ঐ ধরনের সোশালিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠিত হয়। 'মা'তে এর উল্লেখ আছে। গরীব কৃষকের বৌ সোশালিস্ট রেভোলিউশনারী-জাতীয় জনৈকা শিক্ষয়িত্রীর নাম করে মাকে বলে, "…সে ভাল মানুষ, সে আমাদের ভাল চায়, তা—তা একটুখানি ভাল, অবশ্য এতে যদি তার নিজের কোনো ক্ষতি না হয়। কিন্তু লোক একদম সোজা চলতে চায়, এরজন্য তারা কোনও ক্ষয়ক্ষতিকে ভয় করে না—বুঝতে পারছ?—সমস্ত জীবনই তো তাদের কাছে ক্ষতিকর, কাজেই তাদের ফিরে তাকাবার কি আছে? তাদের চারপাশ থেকে শুধু ঐ এক রব, থামো, থামো!—চারপাশ থেকে কেবল ঐ এক চিৎকার।"

গ্রামের খেতমজুর এবং গরীব কৃষক তীব্রতম শ্রেণী-সংগ্রামের
গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের জন্য যে কতটা প্রস্তুত তা তাতিয়ানার ঐ
কথাতেই ফুটে উঠেছে।

খেতমজুর গরীব কৃষকের সঙ্গে মজুরের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের
একটি তাৎপর্য গোর্কি ধরেছিলেন। সেটা এই যে, গ্রামের এই গরীব
মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম শুরু হলে রাষ্ট্রের অধীনস্থ সৈন্যদের উপর রুশিয়ায়
ধরনের প্রভাব পড়তে শুরু করে। খেতমজুর ইয়াকিম বলছে, "আমি
বৎসর ধরে খেতমজুরের কাজ করছি। এই বৎসর আমার সৈন্যদলে যাওয়া
কথা। কাকা মিখাইল আমাকে বলছে, 'যাস না, এখন লোকদের পেটানো
জন্য সৈন্যদের পাঠানো হচ্ছে, কিন্তু আমি যাব।...রাজিন এবং পুগাচেভে
সময়ও তো সৈন্য ছিল। সব শেষ করে দেওয়ার দিন আসছে। তোমা
কি মনে হয়?" বলে ইয়াকিম প্যাভেলের দিকে তাকাল।

প্যাভেল হেসে বলল, "হ্যাঁ সময় এসেছে, কিন্তু কাজটা শক্ত। তোমাদে
জানা দরকার সৈন্যদের কাছে কি বলতে হবে এবং কিভাবে বলতে
হবে।"

ইয়াকিম বলল, "আমরা শিখে নেব, কিভাবে বলতে হয় তা আমরা জেনে
নেব।"

১৯৪৭ সালে সৈন্যদের পোষাকপরা ইয়াকিমের মত খেতমজুর ও গরীব
কৃষক সৈন্যরাই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল। লেনিন তা
সাধারণ সৈন্যদের বরাবর বলতেন, "সৈন্যের পোষাকপরা কৃষক।"

গ্রামের খেতমজুর ও গরীব কৃষকের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের এও এ
বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য সাম্প্রতিক চীনের ঘটনার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে।
যখন মাও সে-তুংয়ের মুক্তিফৌজ ঘোষণা করে যে, কুওমিনটাংয়ের সৈন্য
যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের মধ্যে জমিহীনদের জমি দেওয়া হবে তখ
থেকে আত্মসমর্পণের গতি দারুণ বেড়ে যায়—কারণ আধিকাংশই জো
জমিহীন কৃষক, জমি থাকলে কে আর সহজে সৈন্যদলে চায় ভর্তি হতে।

ছাত্রদের উপর মজুর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথাও গোর্কি কয়েক জায়গা
পরিষ্কার দেখিয়েছেন, শুধু আদর্শগতভাবে নয়, শারীরিকভাবেও। প্যাভেলে
বিচার শেষ হওয়ার পর শহরের যুবক যুবতীরা তাকে ঘিরে ধরে এবং সে
সঙ্গে একটি উত্তেজিত চিৎকার ফেটে পড়ে, "তোমার ছেলে আমাদে

দৃষ্টান্তস্থল", "রুশিয়ার মজুরশ্রেণী জিন্দাবাদ", "মজুরশ্রেণী জিন্দাবাদ"
"ইনকিলাব জিন্দাবাদ" ইত্যাদি।

মধ্যবিত্ত মেয়েদের উপর মজুরশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নও এসেছে।
গরীব কৃষকের বৌ তাতিয়ানা মাকে জিজ্ঞাসা করছে, "আমাকে বল না মা,
শহরের মেয়েরাও কি এই কাজে তোমার মত যোগ দিয়েছে? তারা কি
মজুরের কাছে যায়? তারা কি এইরকম বই পড়ে? তারা কি নাক সিটকায়
না? তারা কি ভয় পায় না?" ইত্যাদি।

এমনিভাবে মায়ের চোখের সামনে দিনের পর দিন আন্দোলন ছড়িয়ে
পড়তে থাকে। মজুরের নেতৃত্বে খেতমজুর গরীব কৃষক ছাত্র মেয়েরা
সংগঠিত হচ্ছে দেখা গেল। মজুর জননী চোখ খোলা রেখে এ সবই লক্ষ্য
করছে। আন্দোলনের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি দিক মার জীবনকে কেন্দ্র করে
গোর্কি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যাতে বিপ্লবের সমস্ত চেহারাটা সাধারণ
মজুর ও বিপ্লবীরা পরিষ্কার দেখতে পায়। গল্পের মধ্য দিয়ে গোর্কি দেখিয়েছেন,
রুশিয়ার বিপ্লবীরা কেমন করে টাকা তোলে, কেমন করে বে-আইনি
ছাপাখানা চালায়, কেমন করে ইস্তাহার লেখা, ছাপা এবং বিলি হয়, কেমন-
ভাবে জেল থেকে বিপ্লবীরা পালিয়ে গেল, কেমনভাবে বিপ্লবীরা সরকারী
আদালতকে ব্যবহার করল, কেমনভাবে সংকটমুহূর্তে বিপ্লবীরা মাথা ঠাণ্ডা
রাখল, কেমনভাবে বিপ্লবের জন্য লুডমিলা তার শিশুপুত্রকে বারোবছর হল
ছেড়ে এসেছে, কেমন করে তরুণী সাশা তার জমিদার বাপকে ছেড়ে এসেছে,
প্রেম সম্পর্কে বিপ্লবীরা কি ধারণা পোষণ করে, কেমন করে পুলিস লোক
খুন করে জনতা দাঙ্গা বাধিয়েছে বলে প্রচার করে, বিপ্লবীরা গোয়েন্দাদের
সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করে ইত্যাদি বিপ্লবী আন্দোলনের চতুর্দিকটা
গোর্কির লেখাতে ফুটে উঠেছে। আরও কতকগুলো দিকও গোর্কি
ফুটিয়েছেন। যেমন দমননীতি সম্পর্কে। যখন মে' ডে-তে পুলিস-মিলিটারী
প্রচুর পরিমাণে এসে হাজির হয় তখন নানালোক নানা কথা বলতে থাকে,
কিন্তু একটি মজুরের কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে, "ওরা আমাদের লোককে ভয় করতে
শুরু করেছে। তাই দেখ, সৈন্য এসেছে, গভর্নর নিজে এসেছে—" অর্থাৎ
দমননীতি শাসকশ্রেণীর শক্তি নয়, দুর্বলতার পরিচয়। মে' ডে-র ধরপাকড়
ইত্যাদির পর জনতার সামনে মা স্বতস্ফূর্তভাবে তার প্রথম বক্তৃতা দিয়ে
ফেলে, "তোমাদের মনের দরজা আজ খুলে দাও, নির্ভয়ে তাকিয়ে দেখ

চতুর্দিক, আতংকিত হয়ো না। তাকিয়ে দেখ আমাদের ছেলেরা ছনিয় প্রবেশ করছে। আমাদের সন্তানরা, আমাদের রক্তের রক্ত যারা, তারা আ সত্যের সন্ধানে চলেছে, বুকে তারা ন্যায়ের আলো নিয়ে নূতুন পথে বাড়িয়েছে—সবাইকার জন্য সোজা এই বিরাট পথ।" গোকি এখা দেখিয়েছেন মা তাঁর নব জাগ্রত চিন্তাগুলোকে গতানুগতিক জীবনে চিরকালের পরিচিত ভাষায় প্রকাশ করতে না পেরে মনে মনে আঁকুপা করছে। অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রাম এবং শ্রেণী-চেতনা মেহনতী মানুষের মধ্যে নতু নতুন ভাষা সৃষ্টি করার যে হৃদয়-বেদনা উপস্থিত করে গোকি সেই দিকটা আশ্চর্য ঐতিহাসিক বাস্তবকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। শ্রেণী-চেত ভাষাব ঐতিহ্যকে কীভাবে বাড়ায় এ তার এক জ্বলন্ত নমুনা। বুর্জো ভাষাবিদ্‌রা ভাষা-বিকাশের এই ঐতিহাসিক দিকটার সন্ধান না পেয়ে আজ রাতকানা হয়ে ঘরে বেড়াচ্ছে।

আর একটি জিনিস গোকি দেখিয়েছেন, সেটা মজুরের গণ-আন্দোলনে পথ। এটা যে সন্ত্রাসবাদ বা ষড়যন্ত্র নয়, এটা যে গণ-আন্দোলন সে কথ প্যাভেল তার জীবনের সব চাইতে দুইটি চরম কাজের মধ্য দিয়ে প্রকা করেছে। প্রথমত, গ্রেপ্তার অবশ্যম্ভাবী জেনেও আন্দোলনের গোড়া শ করার জন্য প্যাভেল মে' ডের হাজার হাজার মজুর-শোভাযাত্রার মাথায় গি দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়ত, সাইবেরিয়াতে নির্বাসন অবধারিত জেনেও এবং জে থেকে পালাবার পূর্ণ সুযোগ সত্বেও দুর্বল আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের প নিয়ে যাওয়ার জন্য প্যাভেল জেল থেকে না পালিয়ে প্রকাশ্য আদালতে বক্তৃ করেছিল। দু'জায়গাতেই দেখা যায়, প্যাভেলের এই নেতৃত্বে অচেতন শ্রমি অংশকে সচেতন করতে এবং গণ-আন্দোলনের ঢেউ জাগাতে সাহায করেছিল।

এমনিভাবে দেখা যায়, শ্রমিক আন্দোলনের প্রায় এমন কোন দিক নেই যেটা গোর্কি স্পর্শ না করেছেন। লেনিন শ্রেণী-চেতনা জাগ্রত করা সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন গোর্কির উপন্যাসে আশ্চর্য্যভাবে তার জীবন্ত প্রকা দেখা যায়।

(৩)

এ থেকে ভারতের প্রগতিশীল লেখকরাও শিখতে পারে—কি করে প্রকৃ বিপ্লবী সাহিত্য লিখতে হয়, কি কি তার উপাদান এবং কিভাবে অচেত

মজুরকে শ্রেণী-সচেতন করা যায় এবং কিভাবে সাহিত্যের মারফত মজুর আন্দোলনের শক্তিকে যথেষ্ট সাহায্য করা যায়। তার মানে এই নয় যে একটা প্যাটার্ন মাফিক লিখতে হবে, 'মা' উপন্যাস খানা তো প্যাটার্ন মাফিক লেখা হয় নি। তার মানে এও নয় যে, শুধুমাত্র শ্রমিক চরিত্রকে কেন্দ্র না করে সাহিত্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের কথা প্রকাশ করা যায় না। তাও যে যায় তার প্রমাণ গোর্কির অন্যান্য লেখা, তার অজস্র প্রমাণ সোভিয়েটের অন্যান্য সাহিত্যিকদের রচনা। কিন্তু মনে রাখা দরকার, শিবহীন যজ্ঞ যেন না হয়ে যায়, অর্থাৎ যে শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাসের মূল পরিচালক তার শ্রেষ্ঠতম নেতারা যেন সাহিত্যে প্রকৃতস্থান দখল করে। বিশেষত এটা এই জন্য মনে রাখা দরকার যে, বাংলার প্রগতিশীল সাহিত্য নামে খ্যাত অনেক লেখাতেই শ্রমিক নেতৃত্ব অগ্রাহ্য হয়েছে—বড় জোর এ সব উপন্যাস কাল্পনিক গ্রাম থেকে শুরু হয়ে কাল্পনিক শহরের উপপ্রান্তে এসে শেষ হয়। অর্থাৎ মজুরশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের নীতি আয়ত্ব না করার ফলে গ্রামের বাস্তবতাও এ-সব লেখাতে ফুটতে পারে নি, কারণ গ্রামে যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে সেটাও যেহেতু ধনতন্ত্রবাদের আঘাতের ফল সেহেতু গ্রামের বাস্তবতাকে ফোটাতে হলে ধনতন্ত্রবাদের সমস্ত যান্ত্রিকতা বা মেকানিজম এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ কাঠামোর স্বরূপ শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টি থেকে আয়ত্ব করতে হয়। এই রকম আয়ত্ব করার ফলেই যে-গোর্কি 'মা' লিখেছিলেন সেই একই-গোর্কির সৃজন প্রতিভা এমন কি পুঁজিপতির খাঁটি চরিত্র অঙ্কিত করে সেখানেও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার, উপন্যাসে ধনিক চরিত্রকে নায়ক হিসাবে আঁকা সম্পর্কে লেনিন গোর্কিকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একমাত্র বিপ্লবের পরে ওদের চরিত্রকে নায়ক হিসাবে দাঁড় করিয়ে লেখা যায়। কেন, সেটা আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। আসল কথা হল, মজুরশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিই সমস্ত শ্রেণীর লোকের বাস্তব জীবনকে সত্যের আলোকে আলোকিত করে দেখতে পারে এবং সেই বর্তমান বাস্তবের মধ্য থেকে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে পারে। অর্থাৎ মার্কসবাদী রাজনীতি গভীরভাবে আয়ত্ব করতে পারলে একমাত্র তবেই সাহিত্যিকেরা আজকের দিনের সব চাইতে গভীরতম সামাজিক বাস্তবকে আয়ত্ব করে মহত্তম সাহিত্য সৃষ্টির পথে এগুতে পারেন। মার্কসবাদী রাজনীতি ছাড়া, লেনিনবাদী রাজনীতির সোনালী আলোর নিবিড় স্পর্শ ছাড়া আজকের দিনে বিপ্লবী সাহিত্য বা কোনো কিছু মহৎ সৃষ্টি অসম্ভব।

ন্যাচারালিজমের দ্বারা বা চোখে দেখা একগাদা বস্তুর বর্ণনা দ্বারা ও-কাজ সম্ভব নয়। গোর্কি 'মা'তে তাই বস্তি, ফ্যাক্টরী, বা ছোটবড় সব ঘটনা ইনিয়েবিনিয়ে বর্ণনা করেন নি, বা ফিরিস্তি দেননি। মার্কস-লেনিনবাদী গোর্কি জানতেন, বুর্জোয়ারা মানুষের পরস্পরের সম্পর্ককে গোপন করে সেটাকে পণ্যের সম্পর্কে দাঁড় করিয়েছে। গোর্কি তাই ন্যাচারালিজমের চোরাবালিতে পা না দিয়ে দেখিয়েছেন, শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের এই হৃদয়ের সম্পর্ক কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই 'হৃদয়' শব্দটার উল্লেখ গোর্কির 'মা'তে প্রায় পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে আর একটা শব্দের উদ্দাম জয়যাত্রার উল্লেখ আছে—সে হল 'সত্য'। 'সত্যের' জন্য প্যাভেল সংগ্রাম করছে, মা সংগ্রাম করছে, 'মা' উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র সত্যের জন্য জীবনপণ সংগ্রামে নেমেছে। কী সে সত্য ? শ্রেণী-সত্য। ন্যাচারালিস্টরা ভূরিভূরি বস্তুর চাপে এই শ্রেণী-সত্যকে গোপন করে রাখে বলেই শ্রেণী সমাজের কোনো বাস্তবকেই ফোটাতে পারে না—বরং তথ্যের ভারে কুয়াশা সৃষ্টি করে। ফলে শ্রেণী-সমাজকে টিকিয়ে রাখতেই তাতে সুবিধা হয়। তাই ন্যাচারালিস্টরা বাস্তবের নামে ঘোরতর অবাস্তবকে সৃষ্টি করে, তাই তারা প্রতিক্রিয়াশীল। আবার ঐ ন্যাচারালিজমেরই উল্টোপিঠ ফর্মসর্বস্ব ফর্মালিজম। গোর্কি এ দু'য়ের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করে সাহিত্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব বা সোশালিস্ট রিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠা করেন। 'মা' এই সোশালিস্ট রিয়ালিজমের প্রথম সৃষ্টি।

গোর্কি বলেছিলেন, "বুর্জোয়া সাহিত্যিকরা 'পজিটিভ হিরো' সৃষ্টির ক্ষমতা চিরকালের মত হারিয়ে ফেলেছে।" গোর্কির 'মা'-তে আমরা এই পজিটিভ হিরোর মৃত্যুহীন চরিত্রের সন্ধান পাই, যারা সাধারণ হয়েও অসাধারণ। গোর্কি এমন একটি ছেলে এবং এমন একটি মা'কে বেছে নিয়েছেন আপাতত যারা তখনকার দিনের মজুর আন্দোলনে বিরল ছিল। বাস্তবজীবনে অমন ছেলের দেখা পাওয়া যেত কদাচিত, আর অমন মা তো দুর্লভ ছিল বল্লেই হয়। গোর্কি নিজেই লিখেছেন, প্যাভেলের মা'ই বোধ হয় রুশিয়ার সর্বপ্রথম শ্রমিক-জননী যে সন্তানের সাম্যবাদী পথে অগ্রসর হয়েছিল। এইরকম বিরল চরিত্র অথচ অগ্রগামী মানুষ প্যাভেল এবং তার মা'র মধ্য দিয়েই গোর্কি গভীরতম বাস্তবকে প্রকাশ করেছেন। ১৯১৭' সালে ঐ এক প্যাভেল লক্ষ প্যাভেলে পরিণত হয়, ঐ এক মা লক্ষ বীর জননীতে পরিণত হয়। অর্থাৎ গোর্কি পরিবর্তনশীল

বাস্তবের মর্মবিন্দুটি ধরেছিলেন এবং তাকে ঐতিহাসিক জীবন্ত বাস্তবতার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বিশ্বসাহিত্যে এই প্রথম সোশালিস্ট রিয়ালিজমের সূচনা এবং জন্ম। প্রগতিশীল বুর্জোয়া যুগের সংস্কৃতির চাইতে এই সোশালিস্ট রিয়ালিজমের যুগের সাহিত্য যে উন্নতস্তরের সেটা বর্তমান সোভিয়েট সাহিত্য দিনদিন প্রমাণ করে দিচ্ছে। গোর্কি সোভিয়েট লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠার সময় বলেছিলেন, "এ ধারণা করার প্রচুর কারণ আছে যে, যখন মার্কসবাদীগণ কর্তৃক সংস্কৃতির ইতিহাস লেখা হবে তখন বোঝা যাবে সংস্কৃতি সৃষ্টির ধারায় বুর্জোয়াদের ভূমিকাকে অসম্ভব বাড়িয়ে দেখা হয়েছে..."

গোর্কির 'মা' লেখার পর চল্লিশ বছর কেটে গেছে। এই চল্লিশ বছরের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব রাষ্ট্রগত, আদর্শগত এবং সংগঠনগতভাবে সারা দুনিয়ায় আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। যা ছিল আন্দোলনের স্তরে তা আজ সোভিয়েট, নয়াগণতন্ত্র এবং চীনের জনতার জীবনে বাস্তব আকার ধারণ করতে চলেছে। মুমূর্ষু ধনবাদী সভ্যতা ভেঙে অন্যান্য দেশেও মজুরশ্রেণী রাষ্ট্রগতভাবে মজুর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। এই চল্লিশ বছরের মধ্যে সাহিত্যে মজুর-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং থিয়োরীও বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। এই রূপেরই নাম দেওয়া হয়েছে সোশালিস্ট রিয়ালিজম—গোর্কি এবং স্টালিন যার প্রতিষ্ঠাতা। এই সোশালিস্ট রিয়ালিজম সারা দুনিয়ার বুর্জোয়া শিল্পী-সাহিত্যিকদের মুখোশ খুলে দিচ্ছে এবং শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম লড়াই চালিয়েছে।

তাই সোশালিস্ট রিয়ালিজম বা সাহিত্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব বিশ্বশান্তি সংগ্রামের এক দুরন্ত হাতিয়ার। তাই সাহিত্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব যারা অস্বীকার করবে বিশ্বশান্তির জন্য তাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হবে।

স্টালিন এই সোশালিস্ট রিয়ালিজমের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে :

"যে সোশালিস্ট রিয়ালিজম সোভিয়েট সাহিত্য এবং সাহিত্য-সমালোচনার মূল পন্থা, সেই সোশালিস্ট রিয়ালিজম সাহিত্যিকদের কাছ থেকে অবস্থার ঐতিহাসিক বাস্তব অঙ্কন এবং তার বিপ্লবী পরিবর্তন দেখতে চায়। এই সত্য এবং ঐতিহাসিক বাস্তবের সঙ্গে, মেহনতী জনতার মধ্যে জীবন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের ও তাদেরকে সাম্যবাদের চেতনায় শিক্ষিত করার যে সমস্যা, সেই সমস্যাকে মিলিয়ে দেখতে হবে।"

বাংলার বিপ্লবী সাহিত্যেরও মূল কথা সোশালিস্ট রিয়ালিজম বা সাহি
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। এই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাস্তব আক
এসে উপস্থিত হচ্ছে, কারণ বাংলা তথা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীও আজ প্রবলভা
রঙ্গমঞ্চে এসে প্রবেশ করেছে। আজ ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃ
খেতমজুর, গরীব কৃষক এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শোষকের বিরুদ্ধে প্রবল শ্রেণী-সংগ্র
শুরু করেছে এবং সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক বিরাট গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গ
তুলছে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রেণী-সংগ্রামের ঢেউ ভারতের
উপকূল প্লাবিত করে উদ্দামবেগে ছুটে চলেছে। হিসাবে দেখা যায়, এ
বাংলা দেশেই ১৯৪৯ সালের প্রথম ছয়মাসে ৩০ হাজার শ্রমিক রাজনৈতি
ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে। শ্রমিকনেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্রুততালে এগুচ্ছে। তা
আরও অগ্রসর হতে সাহায্য করা তো দূরের কথা বাংলার বিপ্লবী সাহিত্য ত
তালে তাল রেখে চলতে পারছে না—পিছিয়ে রয়েছে। তাই
বিপ্লবী সাহিত্যিক আজ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবেন
তার পক্ষে প্রগতিকে অগ্রসর করা তো দূরের কথা, প্রগতির অন্তরায় হ
দাঁড়ানোও অস্বাভাবিক নয়। মজুরশ্রেণী তাদের পিছনে ফেলেই এগিয়ে যাবে
কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রাম যেমন নতুন মানুষের জন্ম দিচ্ছে, তেমনি নতুন সাহিত্যে
জন্মও দেবেই। ইতিহাসের গতি রুদ্ধ হয় না।

এই অগ্রগতির পথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং ম্যাক্সিম গোর্কি আমাদে
সহায়ক, আমাদের শিক্ষক। আর শিক্ষক গোর্কি-পরবর্তী সোভিয়েট সাহিত্য
আগে যেমন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পড়লেও অনেকের মাথায় তেমন করে ঢুক
না, তেমনি অতীতে ম্যাক্সিম গোর্কির লেখাও আমাদের মাথার উপর দিয়ে
গেছে। তাই গোর্কিকে আমাদের নতুন করে চর্চার প্রয়োজন এত বেশী।

আলোচনার জন্য

"বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা"

[প্রবন্ধটির বক্তব্যের সঙ্গে সম্পাদকীয় মতের বিরোধ আছে। আলোচনার জন্য প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হ'ল—পঃ সঃ]

৪নং মার্কসবাদীতে প্রকাশিত 'বাংলা প্রগতিসাহিত্যের আত্মসমালোচনা' সম্পর্কে আমার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছিল অথচ এ পর্য্যন্ত (৫নং মার্কসবাদীতে রবীন্দ্র গুপ্তের আলোচনা প্রকাশিত হবার আগে পর্য্যন্ত) আমি কোন লিখিত মতামত জানাই নি।

কারণ, আমি একটী সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলাম। সে সমস্যা ছিল এই যে, ৪নং মার্কসবাদীর আত্মসমালোচনার সঙ্গে আমার গুরুতর মতভেদ ছিল, আবার লেখাটির মূল উদ্দেশ্য এবং কতকগুলি বক্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সমর্থনও ছিল। সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংস্কারকদের বিরুদ্ধে এই যে প্রথম জোরালো অভিযান সুরু হল, একে ব্যাহত না করে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি সম্পর্কে যে অত্যন্ত সঠিক ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ এর মধ্যে আছে তার গুরুত্ব খেলো না করে, কি ভাবে আত্মসমালোচনায় মারাত্মক ভুল ও অসম্পূর্ণতার সমালোচনা উপস্থিত করা যায়—এই ছিল আমার সমস্যা।

শুধু ভুল দেখানো বা প্রতিবাদ জ্ঞাপন আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সংস্কারবাদের একটা বিপজ্জনক দিক উপেক্ষিত হওয়ায় আত্মসমালোচনা যে খণ্ডিত ও একপেশে হয়ে গেছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাও আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমি বিশ্বাস করি, আমার বক্তব্য সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে এই অভিযানকে শক্তিশালী করবে, এক স্তর এগিয়ে নিয়ে যাবে। অবশ্য আমার এ ধারণা ভুলও হতে পারে।

সংক্ষেপে আমার বক্তব্য ছিল এই :

১। ৪নং মার্কসবাদীর আত্মসমালোচনা সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে নির্ভীক ও বলিষ্ঠ আক্রমণ। কয়েক সংখ্যা 'পরিচয়' অবলম্বন করে লেখাটিতে

বুর্জ্জোয়া-প্রীতি ও সংগ্রাম-বিমুখতার—দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের—স্বরূপ তী
বিশ্লেষণে নগ্ন করে ধরা হয়েছে, যা আমাদের চোখ খুলে দেয়।

২। কিন্তু দুঃখের বিষয় আত্মসমালোচনায় বাংলা সংস্কৃতির ঐতি
সম্পর্কে, ইতিহাস সম্পর্কে এমন ভ্রান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করা হয়ে
যা সমগ্র লেখাটির আবেদন নষ্ট করে দেয়। পরিচয়ের পৃষ্ঠায় ঐতি
বিলাস প্রচুর কিন্তু তার স্বরূপ নির্দ্দেশ করার বদলে, রামমোহন-বি
-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথকে নির্ব্বিচারে ভক্তিসহকারে প্রগতিশীল বলার নি
করার বদলে, একটা মনগড়া সংগ্রামী ঐতিহ্য খাড়া করে সমগ্র ঐতি
কেই বর্জন করতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩। তা'ছাড়া, সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের সমগ্র চেহা
খোঁজা হয়নি, সমগ্রভাবে সংস্কারবাদকে আক্রমণ করার বদলে এক
দিককে মাত্র আক্রমণ করা হয়েছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের আ
মিলিত রূপ—দক্ষিণ পন্থী ও বামপন্থী—দুটি রূপই সুস্পষ্ট। প্রকাশ রা
শুধু দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদটাই দেখেছেন। এই খণ্ডিত দৃষ্টির ফলে আ
সমালোচনায় বামপন্থী সংস্কারবাদের কিছু কিছু সমর্থন রয়ে গেছে।

তার চেয়ে বড় কথা, খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করে সংস্কারবাদকে আঘা
করার অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, ছদ্মবেশী বামপন্থী সংস্কারবাদ এই আ
তেরই সুযোগ গ্রহণ করে; সংস্কারবাদ এই পথ খোলা পেয়ে বামপ
ভেক ধারণ করে টিকে থাকতে চায়।

৪। দক্ষিণপন্থী ও ছদ্মবেশী বামপন্থী সংস্কারবাদ অতীতের সংস্কা
বাদী যান্ত্রিকতারই জের। আমরা প্রায় সকলেই কমবেশী এই রো
ভুগছি। ৪নং মার্কবাদীর আত্মসমালোচনায় অসম্পূর্ণতা ও ঐতিহ্য সম্প
গুরুতর ভুল এই যান্ত্রিকতারই প্রভাবের দরুণ।

সংস্কারবাদী যান্ত্রিকতার মূল কথা—মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং শ্রে
সংগ্রামের জটিলতা ও শ্রেণীসম্পর্কের বাস্তবতাকে পরস্পর নিরপে
করার ঝোঁক। জোশীবাদের ভিত্তি ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বির
করা, সুবিধামত ঢেলে সাজা। সংস্কৃতি ফ্রণ্টে তার প্রত্যক্ষ ফল দে
গিয়েছিল, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সংস্কৃতি আন্দোলনের বাস্তবতার ম
ভাসুর ভাদ্রবউ সম্পর্ক গড়ে ওঠায়। প্রত্যক্ষ আন্দোলনের মধ্য থে
যে কোন বাস্তব প্রশ্ন উঠুক, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগ করে ত

বাস্তব সমাধান খোঁজা যতই জরুরী হোক, আলোচনা সেই বাস্তব প্রকৃত সমস্যার পাশ কাটিয়ে উঠে যেত মার্কসীয় দর্শনের মূলতত্ত্বের বিচারে এবং শেষ পর্যন্ত সেইখানেই আটকে থাকত। একটা জীবন্ত আন্দোলনের জীবনটাই নির্ভর করে শত শত প্রশ্ন ও সমস্যার আদর্শগত সঠিক সমাধান খুঁজে তা প্রয়োগ করার উপর—এ দাবী মেটার বদলে পাওয়া যেত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পক্ষে অনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যহীন ওকালতি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে স্বয়ং বিষ্ণু দে—একজন জ্যান্ত প্রগতি-গর্ব্বী কবি ও বিশিষ্ট মার্কসবাদী (!)—যখন সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেন, তখন পর্য্যন্ত বিষ্ণু দের লিখিত কবিতা ও লিখিত মতামতের বাস্তব দলিল বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি প্রগতিশীল অথবা প্রতিক্রিয়ার দালাল এটা স্থির করার কোন চেষ্টাই হল না—বিচারটা পরিণত হল সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে মার্কসীয় মূলনীতি নিয়ে সূক্ষ্ম ও জটিল তর্কে। মার্কস-বাদের একটা ভুল কিন্তু জটিল বাখ্যা দিয়ে বন্ধুভাবে আমাদের তুমুল বিতর্কে নামিয়ে আসল কাজ নষ্ট করা ও বিভ্রান্তি বিস্তারের কী সহজ কৌশল!

আমরা নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিলাম বলেই এ কৌশলে ভুলেছিলাম মনে করলে ভুল হবে! বিষ্ণু দে-দের মার্কসবাদ না শেখালে আমাদের মোক্ষলাভ হবে না (শত শত জঙ্গী শিখুক বা না শিখুক, প্রশ্ন করে জবাব পাক বা না পাক) এরূপ মনে করার দরকার আমাদেরও কম ছিল না, নইলে যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বাস্তবতা থেকে পৃথক করে রাখা যায় না!

এই 'থিয়োরি নিয়ে কচকচি' জঙ্গীদের মনে থিয়োরি সম্পর্কে কৃত্রিম বিতৃষ্ণা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। যে থিয়োরি ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর লড়াই এক পা এগোতে পারে না তার সম্পর্কে এমন ধারণাও জন্মায় যে থিয়োরি আন্দোলনকে ব্যহত করছে। এরূপ ধারণা অমূলক ছিল না। সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রয়োগের পরিবর্তে থিয়োরি পৃথক ও বিচ্ছিন্নভাবে চর্চার জন্য রাখলে এরূপ অনেক ক্ষতিকর ফলাফল অবশ্যম্ভাবী।

জোশীবাদের গোড়া কাটা গেছে, কিন্তু এখনো মূলোচ্ছেদ বাকি। স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে এমনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও বাস্তবতাকে সম্পর্ক-হীন করে রাখা যায় না, কিন্তু জেরটা এখনো চলছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১নং মার্কসবাদীতে প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি ধারা' প্রবন্ধটিতে সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিন-বাদ ও বাস্তবতার দূরত্ব ঘুচিয়ে দেবার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা হয়। এই প্রবন্ধেই বিষ্ণু দের কবিতা ধরে তার 'তৃতীয়পক্ষের' ছদ্মবেশ উন্মোচন করে সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে দেওয়া হয়। শ্রেণী-সংগ্রাম ও সামাজিক রূপান্তরের ভিত্তিতে বাংলা সাহিত্যের মূল ধারাগুলির শ্রেণী পক্ষপাতিত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে, ধনবাদী সভ্যতার শেষ যুগে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সাহিত্য, উঠ্‌তি প্রগতি সাহিত্য ও প্রগতি-মার্কা দালালী সাহিত্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রবন্ধেই আমরা প্রথম পাই। সংস্কার-বাদকে খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখা—আত্মসমালোচনার এই দুর্ব্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিপূরক, এই সমালোচনা ব্যাহত করার বদলে অভিযানকে শক্তিশালী করবে। কিন্তু ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার যে মত তদনুসারে প্রকাশ রায়ের ভুলটি এমনি মারাত্মক, এটি সমস্ত প্রবন্ধের এমন একটি মূল ভিত্তি যে এই ভুল দেখিয়েও সঠিক বক্তব্যগুলি বাঁচিয়ে আমার সমালোচনা যোগ করার বিশেষ কোন সার্থকতা আছে কিনা বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

৫নং মার্কসবাদীতে রবীন্দ্র গুপ্ত দেখিয়েছেন যে ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার ধারণাই ভুল, প্রকাশ রায়ের বক্তব্য সঠিক। রবীন্দ্র গুপ্তের মত আমি গ্রহণ করেছি। আমার মতটা কি ছিল এবং কিভাবে আমি রবীন্দ্র গুপ্তের মত গ্রহণ করেছি একটু বলা দরকার। রবীন্দ্র গুপ্তের মতের সঙ্গে আমার মতের মূল পার্থক্য কি ছিল? আমি জানতাম, বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ পৃথক কোন প্রগতিশীল ধারা পূর্ব্বে গড়ে ওঠে নি, শ্রমিক শ্রেণীর বর্ত্তমান সংগ্রামের মধ্যেই এরূপ স্বাধীন ও আত্মসম্পূর্ণ প্রগতিশীল ধারা সৃষ্টি হচ্ছে। রবীন্দ্র গুপ্ত দেখিয়েছেন, রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের মূল ধারার পাশা-পাশি একটি স্বতন্ত্র প্রগতিশীল ধারা ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যায়, সিপাহী-বিদ্রোহ নীল-বিদ্রোহ প্রভৃতি বৃটিশ-বিরোধী গণসংগ্রামের প্রভাব ও মর্মকথা যার ভিত্তি।

ইতিহাসের বাস্তব বিচার ও শ্রেণীগত বিচারে এই পার্থক্যের মোট তাৎপর্য্য কি?

প্রথমেই বলা দরকার, সিপাহী-বিদ্রোহ, নীল-বিদ্রোহ প্রভৃতির বিপ্লবী

ভূমিকা অস্বীকার করে আমার মত গড়ে নি, বরং তার বিপরীত। পরাধীন দেশে বিদেশী শাসকের বিরোধিতাই যে প্রগতি বিচারের মূল কথা, আমিও এই নিরিখেই ঐতিহ্যের বিচার করেছিলাম।

আমার অবশ্য ধারণা ছিল, সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী থেকে এসেছে। কিন্তু সেজন্য এই বিদ্রোহকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করার কোন কারণ দেখিনি। নেতৃত্বের শ্রেণী প্রকৃতি যাই হোক, যোদ্ধার বেশধারী কৃষকশ্রেণীর বৃটিশ শাসন উচ্ছেদের আদর্শের সঙ্গে এই নেতৃত্বের শ্রেণীস্বার্থের বিরোধ ছিল না। কারণ, বৃটিশ শাসনে ফিউডাল রক্ষণশীল শ্রেণীর একাংশ অর্থসম্পদ ও ক্ষমতা সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়, বৃটিশের বিশ্বস্ত ও কৃপাপুষ্ট রাজা-মহারাজা-নবাবদের সঙ্গে এদের স্বার্থের মিল ছিল না। যদিও এই অংশের পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ করে বাহাদুর শাহ-এর বাদশাহী সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিজেদের পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়ে আনা কিন্তু এদের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ও কৃষকশ্রেণীর উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন—বলপূর্ব্বক বৃটিশ শাসনের অবসান। সুতরাং এদের নেতৃত্বের শ্রেণী উৎস স্বত্ত্বেও সিপাহী বিদ্রোহের বিপ্লবী ভূমিকা মূলতঃ অপরিবর্ত্তিত থাকে।

ফিউডাল রক্ষণশীল শ্রেণীর একাংশ যে এরূপ দুরবস্থায় পতিত হন স্বয়ং দিল্লীর বাদশাহের পরিবারের নিম্নলিখিত অবস্থার বিবরণ থেকেই তা অনুমান করা যায়। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র ২য় খণ্ড ৩৫৪ পৃষ্ঠায় ১৮৩৩ সালের ২১শে ডিসেম্বরের 'সমাচার দর্পণ' থেকে উদ্ধৃতিতে আছে:

> "ঐ পত্রের লেখক আরও লেখেন যে বর্ত্তমান বাদশাহের পৌত্রেরদের মধ্যে কেহ কেহ মাসিক এক শত টাকার অধিক প্রাপ্ত হন না এবং বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্র এবং মাতৃস্বস্রীয় ও পিতৃস্বস্রীও ও অন্যান্য বহিরঙ্গ কুটুম্বেরা তৈমুর বংশ হইয়াও একজন মসালচির মাহিয়ানার তুল্য বেতন এবং বাদশাহের বাবুর্চিখানা হইতে কিঞ্চিৎ২ পোলাও পাইয়া কোনরূপে কালযাপন করিতেছেন।"

ইতিহাসের সমসাময়িক বাস্তব অবস্থার হিসাব না ধরে যান্ত্রিকভাবে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্বের শ্রেণী-চরিত্র বিচার করতে অগ্রসর হওয়ায় বিদ্রোহের শ্রেণীভিত্তি সম্পর্কে কয়েকজন ভুল করেছেন। শ্রেণী হিসাবে ফিউডাল রক্ষণ-শীল শ্রেণী এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করে নি, এই শ্রেণী ইংরাজের সঙ্গে আপোষ

করে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকাই নিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব যাদে ছিল তারা এই শ্রেণী থেকে এসেছিল শুধু এইটুকু ধরলে ভুল সিদ্ধান্ত করতে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা শ্রেণীচ্যুত হয়েই বিদ্রোহের নেতৃত্বগ্রহণ করে। সুতরাং সিপাহী বিদ্রোহকে সম্পূর্ণরূপে কৃষক-বুর্জোয়া বিদ্রোহ বলে গণ্য করতে দ্বিধার কারণ থাকতে পারে না।

রবীন্দ্র গুপ্ত ঠিকই বলেছেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব ফিউডাল রক্ষণ- শীল শ্রেণীর ছিল না, কিন্তু নেতৃত্ব যে এই শ্রেণী থেকেই শ্রেণীচ্যুত অংশের ছিল তিনি তা বলেন নি। কৃষকশ্রেণী থেকেই সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব আসে, তাঁর এই মত এখন পর্য্যন্ত আমি মানতে পারছি না। সেটা তথ্যাদি অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

কিন্তু সেজন্য মূল প্রশ্নের ব্যতিক্রম ঘটে না, ফিউডাল প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী থেকে শ্রেণীচ্যুত হয়ে নেতৃত্ব এসেছে অথবা কৃষকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত হয়েছে তাতে সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ বদলায় না। সিপাহী বিদ্রোহ এদেশে প্রথম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

সিপাহী বিদ্রোহের এই বিপ্লবী স্বরূপ মেনেও এই গণ-বিদ্রোহের ঐতিহ্য বহনকারী ধারা সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছিল মনে করতে পারি নি। কিছুকালের জন্য সংস্কৃতির উপর এই বিদ্রোহের জোরালো প্রভাব পড়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু এমন একটি বিপ্লবী ধারা সৃষ্টি হয় নি যা অব্যাহতভাবে বয়ে এসেছে। ইতিহাসের বাস্তবতা বলপূর্ব্বক বৃটিশ শাসন উচ্ছেদের আদর্শ নিয়ে এরূপ গণ- বিদ্রোহ অসম্ভব করে দেয়।

নীল-বিদ্রোহ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ নিঃসন্দেহ গণ-বিদ্রোহ। কিন্তু এসব বিদ্রোহ ছিল আঞ্চলিক ও সীমাবদ্ধ এবং মূলতঃ বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ এসব বিদ্রোহের আদর্শ ছিল না। ইংরাজের শোষণ ও অত্যাচার বিশেষ ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেলে তারই বিরুদ্ধে এই সব গণ-বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। এসব বিদ্রোহের যে প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে ঐতিহ্য হিসাবে তা প্রগতিবাদীর কাছে খুবই মূল্যবান কিন্তু সাহিত্যে এসব বিক্ষিপ্ত।

সিপাহী বিদ্রোহের ঘা খেয়ে ইংরেজ এদেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে আপোষ করে নি, রাজা-মহারাজা-নবাব-উজিরদের সঙ্গে তারা আগেই আপোষ করেছিল—তাদের পদানত কুকুর বানিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজকে আতঙ্কে কাঁপিয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে টের পাইয়ে দেয়, শুধু প্রতিক্রিয়ার এই

কর্ত্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আপোষ করেই এদেশে টেকা যাবে না, আরও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াকে নিজের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং শাসন ব্যবস্থার শক্ত কাঠামো গড়ে তারই আশ্রয়ে শোষণ চালাতে হবে।

১৮৫৩ সালের লেখা কার্ল মার্কসের 'ভারতের গবর্ণমেণ্ট' প্রবন্ধে (ভারত সম্পর্কে রচনাবলী) বিলাতের ব্যবসাদারী বোর্ড ও সরকারের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হত তার স্বরূপ খুলে ধরা হয়েছে। সারা দেশে যে অরাজকতা বিরাজ করত তার যে সব বিবরণ পাওয়া যায় তার চেহারা সত্যই ভয়াবহ। মানুষের ধনসম্পত্তি ও জীবনের কোন নিরাপত্তাই ছিল না। পুলিশ পর্য্যন্ত রাত্রে ডাকাতি করত, দিনে সেই ডাকাতির জন্য দলে দলে লোক পাকড়াও করে ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দিত। অর্থাৎ এককথায়, রাষ্ট্র শুধু নামেই ছিল, শোষণের জন্য যে রাষ্ট্রশক্তি আবশ্যক তাও ইংরেজ খাড়া করতে সময় পায় নি, এতই সে ব্যস্ত ছিল লুণ্ঠনে।

সিপাহী বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজ নূতন ভাবে শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে, 'আইন ও শৃঙ্খলা' বজায় রাখার ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ তাদের সাথে সাথে অসংখ্য দেশী চোর ডাকাত খুনেদেরও যে লুটতরাজ ও হত্যা চালিয়ে যাবার অবাধ অধিকার ছিল সেটা সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। ব্যবসা ও রাজনীতি পৃথক করে দেয়।

ব্যাপক অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কবল থেকে সাধারণ লোক মুক্তি পায়। এই যে নিরাপত্তা, দেশের দরিদ্রতম লোকটির প্রতি এই যে আশ্বাস— তুমি শোষিত হও, নিপীড়িত হও, রোগে দুর্ভিক্ষে মরে যাও, একটা নিয়ম- তান্ত্রিকতার ভিতর দিয়ে মরবে, তোমারও বেঁচে থাকার, কাজ করার, কোটিপতি হবার সমান অধিকার আইনে স্বীকৃত—এটাই হল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল কথা। সিপাহী বিদ্রোহের পর এদেশে প্রথম বিদেশীর ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র স্থাপিত হয়।

রেলপথ, টেলিগ্রাফ, শিল্প শ্রমিকের সৃষ্টি ইত্যাদি পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে নূতন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনার উন্মেষ হওয়ার আগে বলপূর্বক বৃটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য ব্যাপক বিদ্রোহ অসম্ভব হয়ে যায়।

বিশেষতঃ, বৃটিশের একটি মূল রাজনীতি ছিল প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কার প্রাণপণে বজায় রাখা। তারা জানত, দেশ যত পশ্চাদ্‌পদ থাকবে, তাদের শাসনও তত দীর্ঘস্থায়ী হবে।

নীল-বিদ্রোহ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, এ বিদ্রোহ ছড়ায় নি। অন্যান্য বিদ্রোহ সম্পর্কেও একই কথা।

পুরাণো ফিউডাল ব্যবস্থা ও সংস্কার ভাঙ্গা এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে জাতীয় চেতনার বিকাশকে এগিয়ে নেওয়া, প্রগতির ভিত্তি ছিল এই। ইংরেজ শাসনকে সাহায্য করার পাশাপাশি এই ভবিষ্যতে, ইংরেজ তাড়িয়ে স্বাধীন হবার এই ধারাকেই প্রগতিশীল বলে ধরে নিয়েছিলাম।

অর্থাৎ রামমোহন-বিবেকানন্দ-কালীপ্রসন্ন-দীনবন্ধু-মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল সকলের ভিতর দিয়ে একটিই প্রগতির ধারা। কম অথবা বেশী।

তাই নির্বিচারে কাউকেই শ্রমিকশ্রেণী যে গ্রহণ করতে পারে না— এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম। প্রত্যেককে যাচাই করে বেছে নিতে হবে, কি ও কতটুকু কার প্রগতিশীল।

যেমন, রামমোহন। রামমোহনের ধর্মসংস্কার নয়, পুরাণো প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইটাই প্রগতিশীল। এ লড়াই এদেশকে পুরাণো দিনের অন্ধকারে আটকে রাখার যে রাজনীতি ইংরেজের, তার বিরুদ্ধেও লড়াই।

যেমন, বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের মতামত চুলোয় যাক, শ্রমিকশ্রেণী শুধু দেখবে যে তিনি সে যুগে এদেশের প্রথম প্রকৃত সংগঠক। সেবাধর্মের ভিত্তিতে হলেও সত্যসত্যই 'কর্মের' জন্য এরূপ সংগঠন তাঁর আগে কেউ গড়তে পারেন নি (ইংরেজ আমলে)। এই সংগঠনের বহু কর্মী পরে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দান করেন।

নীল দর্পণকেও আমি সাহিত্যের মূল প্রগতিশীল ধারায় একটি বিশেষ রত্ন বলে ধরেছিলাম, পৃথক গণনা করিনি। নীলদর্পণ ঘৃণা ও বিক্ষোভ জাগায়, কিন্তু জাগায় অত্যাচারকে বড় করে তুলে ধ'রে, বিদ্রোহকে নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রগতিশীলতা দু'টি ভিন্ন খাতের, আমি তাও ধরিনি। রবীন্দ্রনাথের রচনা যতখানি প্রগতিশীল, তার যে মূল সুর নজরুলে সেটাই আরও তীব্র ও স্পষ্ট হয়েছে, এই ছিল আমার ধারণা। তাছাড়া নজরুলের ফুলেল গান ও কবিতাগুলিও আমি গণ্য করেছিলাম।

রবীন্দ্র গুপ্তের লেখা পড়ে খুঁজে দেখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মিলের মধ্যেও আমি একটি মৌলিক পার্থক্য দেখতে পেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে॥
আজকে যে তোর কাজ করা চাই, স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই,
এখন, ওরা যতই গর্জাবে ভাই তন্দ্রা ততই ছুটবে,
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে॥
ওরা ভাঙ্গতে যতই যাবে জোরে গড়ব ততই দ্বিগুণ করে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে ঢেউ উঠবে॥

নজরুলের—

এই শিকল পরা ছল, মোদের শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।
তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুটিই ধরব টিপে, করবো তারে লয়।
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনবো বরাভয়,
মোরা ফাঁসি পরে আন্‌বো হাসি মৃত্যুজয়ের ফল।

নজরুল অনেক বেশী লড়ায়ে কিন্তু মূল সুরটা একই। পার্থক্যটা মৌলিক হয়ে ওঠে শেষের বাকী লাইনগুলিতে।

রবীন্দ্রনাথের গানের শেষ—

তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু, জেগে আছেন জগৎ প্রভু,
ওরা ধর্ম যতই দলবে ততই ধূলায় ধ্বজা লুটবে
ওদের ধূলায় ধ্বজা লুটবে।

নজরুলের গানের শেষ—

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্ঝনা
সে যে মুক্তি পথের অগ্রদূতের চরণবন্দনা,
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।

বিদ্রোহের সুরে নজরুলের গান শেষ হল, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি উর্দ্ধে উঠে গেল তাঁর সদা জাগ্রত জীবন প্রভুর কাছে ভরসা চাওয়ার জন্য।

বঙ্কিমকে আমি চিরদিন প্রধানতঃ প্রতিক্রিয়াশীল বলেই জেনে এসেছি। কিন্তু বঙ্কিমের মধ্যেও প্রগতির কিছু কিছু চমক আছে।

সিপাহী বিদ্রোহ নীল বিদ্রোহ প্রভৃতির ঐতিহ্য বহন করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃথক কোন ধারা সৃষ্টি হয়নি, এই ধারণাই রামমোহন-রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে বর্জন করে শুধু দীনবন্ধু নজরুলকে প্রগতিশীল বুলে গ্রহণ করার পক্ষে আমার বাধা ছিল। এইরূপ পৃথক ও বিপ্লবী ধারা যে বাংলার সংস্কৃতিতে আছে, রবীন্দ্রগুপ্ত তার ভিত্তি সরবরাহ করেছেন। সুতরাং আমি আগ্রহের সঙ্গে এই ভিত্তি গ্রহণ করেছি। অবশ্য এই ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আরও বিচার ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন। সেটা অন্য কথা।

আমার মূল বক্তব্যের ২ নং বক্তব্যের মীমাংসা হয়েছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের 'সমগ্র চেহারা' সম্পর্কে আলোচনায় নামার আগে রবীন্দ্রগুপ্তের প্রবন্ধকে ভিত্তি করেই প্রকাশ রায়ের, দৃষ্টিভঙ্গিতে যান্ত্রিকতার প্রভাব সম্পর্কে, অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সার্থক প্রয়োগে বাস্তবতা সম্পর্কে উদাসীনতার বিষয়ে একটু আলোচনা করব।

আমি চুলচেরা বিচারে নামছি না, বা কথার মারপ্যাঁচ কষছি না। এই পার্থক্যটুকুই মার্কসবাদী বিচারে আকাশপাতাল তফাৎ ঘটিয়ে দেয়। কারণ, বিচারের মূল ভিত্তিটা জানিয়ে দিয়ে বিচারে নামার অর্থই বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দান, পুরাণো বিভ্রান্তি যে কতদূর ব্যাপক ও দৃঢ়মূল এ সত্যকে এড়িয়ে না যাওয়া, যাদের জন্য আত্মসমালোচনা তাদের চেতনাকে পাশ না কাটানো : অন্যথায় সোজাসুজি বিচারে নামার অর্থই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা, যান্ত্রিকতা।

রবীন্দ্র গুপ্ত দেখিয়েছেন, ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রকাশ রায়ের বক্তব্য সঠিক। আমার মতে, এটা মানতে কোন মার্কসবাদীরই এখন অর্থাৎ রবীন্দ্র গুপ্তের আলোচনা পড়বার পর, দ্বিধা হবে না।

কিন্তু এ থেকেই কি বেরিয়ে আসে না প্রকাশ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে যান্ত্রিকতার প্রভাব? তিনি সঠিক কথাই বলেছেন কিন্তু বাস্তবতা খেয়াল রেখে এমনভাবে বলেন নি যাতে তাঁর বলাটাও সঠিক হয়, সার্থক হয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগের উপরেই যে সবকিছু নির্ভর করে—এবং প্রয়োগের অর্থই বাস্তবতাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া—এবিষয়ে তাঁর

উদাসীনতার দরুণ আমরা কেউ ধরতেও পারি নি তিনি ঠিক কথা বলছেন, বরং উল্টোটা ভাবতেই বাধ্য হয়েছিলাম।

এমনভাবে তিনি সংস্কৃতি আন্দোলনের একটি মূল প্রশ্ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের চেতনার উপর দিয়ে চলে গেছে।

১নং মার্কসবাদীর 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' মূলতঃ সংস্কার-বাদের বিরুদ্ধেই প্রথম অভিযান। এই প্রবন্ধের পরোক্ষ আঘাতেই সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ বামপন্থী সংস্কারবাদের খোলস গ্রহণের চেষ্টা করে।

প্রকাশ রায় সংস্কারবাদের রূপান্তর গ্রহণের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার একটা দুর্বল উদাহরণ দিয়েছেন—যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, দক্ষিণপন্থী সংস্কার-বাদের বামপন্থীরূপ গ্রহণের প্রচেষ্টা হিসাবে নয়। এদিকটা তাঁর চোখেই পড়ে নি।

১নং মার্কসবাদী প্রকাশিত হবার (অক্টোবর, ১৯৪৮) কিছুদিন পরেই পরিচয়ে (কার্তিক, ১৩৫৫) গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির সংকট' প্রকাশিত হয়।

"তাই গোপাল বাবু এই প্রবন্ধে বুর্জোয়া রাজনীতিকদের সম্পর্কে যতখানি নির্মম হতে পেরেছেন—এই রাজনীতিকদের সাংস্কৃতিক মুখ-পাত্রদের সম্পর্কে তার সিকিমাত্র কঠিন হতে পারেন নি। নেহরু, প্যাটেল, কিরণ, বিধানচন্দ্রকে গোপাল বাবু সঙ্গত ভাবেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন, কিন্তু তারাশঙ্করের 'ফিউডাল আধারের মোহ' এবং বনফুলের 'ন্যাশনালিজমের প্রতারণা'র উল্লেখ করেছেন মাত্র একবার, তাও বন্ধনীর মধ্যে ক্ষীণ কণ্ঠে। এ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, বুর্জোয়া ঐতিহ্যের মোহ। বুর্জোয়া ভাবধারা তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলেই বুর্জোয়া সংস্কৃতিবিদ্‌দের সম্পর্কে তাঁর লেখনী শাণিত হয়ে ওঠে না, সে সময় তাঁর কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসে। **অথচ এই সংস্কৃতি আন্দোলনই তাঁর সংগ্রাম ক্ষেত্র। এখানকার শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে সাধারণভাবে সরকারের রাজনৈতিক সমা-লোচনা করা আসলে সংগ্রাম এড়িয়ে যাবারই একটা কায়দা। এই আস্ফালনে বীরত্ব কিছু নেই, আসলে তা সংগ্রাম বর্জন।**" (বড়হরফ আমার) ৪নং মার্কসবাদী, পৃঃ ১১৫।

এই প্রবন্ধটির আগে গোপালবাবু যত লেখা লিখেছেন সে সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও বুর্জোয়া রাজনীতিকদের 'সঙ্গতভাবেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত' করার আস্ফালন পাওয়া যাবে না। প্রকাশ রায় ঠিকই ধরেছেন যে এটা 'আসলে সংগ্রাম এড়িয়ে যাবারই একটা কায়দা'। কিন্তু যেহেতু তিনি সংস্কারবাদকে দেখেছেন একপেশে দৃষ্টিতে শুধু দক্ষিণপন্থী রূপে, পরিচয়ের পৃষ্ঠার বাইরে সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রের দিকে তাকান নি, সংস্কারবাদের অতীত রূপ যাচাই করেন নি, সেই হেতু সংগ্রাম এড়িয়ে যাবার এই কায়দার মধ্যে 'সংস্কৃতির রূপান্তরের' মধ্যে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ কিভাবে বামপন্থী রূপান্তর লাভের চেষ্টা করছে সেটা তিনি ধরতে পারেন নি।

নিজ সংগ্রামের ক্ষেত্রের দায়িত্ব বর্জনের এটা নরম কায়দা, কারণ এটা বুর্জোয়া প্রীতির সংগ্রামী ছদ্মবেশ ধারণের চেষ্টা মাত্র। কিন্তু এই ঝোঁকটাই উগ্র হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে যাদের বুকে প্রকৃত ক্ষোভ ও ঘৃণার আগুন জ্বলছে।

মার্কসবাদী নেতৃত্ব লিখেছিলেন :

"এ সবগুলিই দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের প্রকাশ্য অভিব্যক্তি। এর সঙ্গে এক নূতন ব্যাধির যোগ হয়েছে—তা হল চোরা সংস্কারবাদ। এই চোরা সংস্কার-বাদ বামপন্থী বিপ্লববাদের ভেক ধারণ করেছে—সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম প্রচেষ্টা হিসাবে নিজকে চালু করেছে।

"এই ঝোঁক অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ অনেক ভাল ভাল কর্মী—যাঁদের সত্যিকারের বিপ্লবী সংস্কারবাদের কবল থেকে বেরিয়ে এসে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার ইচ্ছা কারুর থেকে কম নয়—তাঁরাও দমননীতির বিরুদ্ধে ক্রোধে এবং ঘৃণায় উদ্দীপিত হয়ে এবং অস্থিরতার দরুণ এই ব্যাধির কবলে পড়ে যাচ্ছেন।"

বাংলার প্রগতি লেখকদের গত ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলনে এর নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। 'ঘোষণাপত্রে'র খসড়া নিয়ে সংস্কারবাদ ও বামপন্থী বিপ্লববাদের টাগ-অব-ওয়ার! সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের সন্ধান শুধু পরিচয়ের পৃষ্ঠার না করে এই সম্মেলনের দিকে তাকালে সংস্কারবাদের বামপন্থী চেহারা প্রকাশ রায়ের চোখ এড়িয়ে যেত না। ঘোষণাপত্রের খসড়াটী ছিল সংস্কার বাদের সংগ্রাম-বিমুখতার দলিল—চোস্ত ভাষায় ছকে

ফেলা প্রাণহীন আহ্বান। আজকের দিনের সংস্কৃতির সমস্যা ও প্রগতিবাদী লেখকশিল্পীর কর্তব্যকে যখন তুলে ধরাটাই বড় প্রয়োজন, বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতির উপর বুর্জোয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও শাণিত আহ্বান দেওয়া একান্তভাবে জরুরী—প্রগতি লেখক সম্মেলনের ঘোষণাপত্র তখন বুর্জোয়া ঘোষণাপত্রের বিশুদ্ধ ফর্ম বজায় রাখতে সচেষ্ট। এদেশে ইংরেজ আগমনের ফলে ফিউডাল যুগের অবসান, সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ, ধনবাদী সভ্যতার প্রগতিশীল যুগ—এই অতীত থেকে ঘোষণাপত্র বর্ত্তমানে এসেছে, বর্ত্তমান যুগের সমস্যা ও প্রগতিবাদীর দায়িত্বের নিষ্প্রাণ তালিকা দাখিলে শেষ হয়েছে। সম্মেলনের তীব্র প্রতিবাদের সঙ্গে আপোষ করে অনেক রদবদলের পরও গৃহীত ঘোষণাপত্রটি (পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, ১৩৫৬) এই প্রাণহীন ফর্ম্যালিজমের কবল থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

এবং প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সম্পাদক ও সম্মেলনের কার্য্যকরী সভাপতি অতি মৃদু একটু আপত্তি জানিয়ে, প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের জন্য যেরকম ঘোষণাপত্র বার করা হয়েছে ওরকম হলে ভাল হত, শুধু এইটুকু বলে, খসড়াটি গ্রহণ করা চলতে পারে এই অভিমত প্রকাশ করেন।

অপরদিকে কয়েকজন ডেলিগেট ঘোষণাপত্রে এমন সব কথা ঢুকিয়ে দেবার দাবী করেন, যেমন, সমস্ত প্রগতিবাদী লেখকের পক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সভায় যোগদান বাধ্যতামূলক করা, শ্রমিক শ্রেণীর জন্য সহজিয়া সাহিত্য, তুলিকলম ত্যাগ করে বন্দুক ধরা ইত্যাদি—যা পাতিবুর্জোয়া বামপন্থী বিপ্লববাদেরই চরম নিদর্শন। সম্মেলনে পঠিত চিন্মোহনবাবুর প্রবন্ধ 'সাহিত্য ও সংগ্রাম'-এ (পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, ১৩৫৬) এই দাবীর পিছনের মনোভাবই মোটামুটি প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু যে রূপেই প্রকাশ পাক মূলতঃ এটা সংস্কারবাদ ছাড়া, সংগ্রাম বর্জনের কায়দা ছাড়া আর কিছুই নয়—এই সব অসম্ভব ও অবাস্তব বড় বড় দাবী শ্রেণী সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী সংগ্রামের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করে, আন্দোলনের বাস্তব ক্ষেত্র ও বৈশিষ্ট্য বিচার করে তোলা হয় নি। তাই, শেষ পর্য্যন্ত আপোষে চরম দাবী ছেড়ে দিয়ে সংশোধিত ঘোষণাপত্র মেনে নিতে সবাই রাজী হয়ে যান।

এদিকে সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতৃত্বেরও মারাত্মক ত্রুটি ঘটেছে : যেভাবেই বলা হয়ে থাক এবং যতই বেঠিক মনে হোক, প্রকাশ রায়ের বক্তব্য সম্পর্কে

অনুসন্ধান ও গবেষণা না করে পুরাণো ধারণার ভিত্তিতে প্রতিবাদ করে ক্ষান্ত হয়েছেন।

কিন্তু আমি শুধু সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতৃত্বের কথা বলছি না। আমর দশজন সাধারণ মার্কসবাদী ও মার্কসবাদে বিশ্বাসীরাও তো আছি— অবিশ্বাসীরাও যে সংখ্যায় কিছু কম তাও তো নয়! আমরা এবং অবিশ্বাসী সুবিধাবাদীরাই বাস্তবতার আসল প্রতিফলক।

বাস্তবতা কি ছিল? ঐতিহ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মোটামুটি একটি ব্যাপক ও দৃঢ়মূল ধারণা সৃষ্টি হয়ে আছে। ধারণাটি স্বতঃস্ফূর্ত নয় বা একেবারে প্রতিক্রিয়ার কাছ থেকে ধার করা নয়। কার্ল মার্কসের লেখা, কমরেড রজনী পাম দত্তের লেখা, ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে অন্যান্য আলোচনা গ্র ইত্যাদির ভিত্তিতে ধারণাটি গড়ে উঠেছে—এবং এটা মার্কসবাদ-সম্মত বলেই অধিকাংশের বিশ্বাস।

এ ধারণা ভ্রান্ত। কিন্তু ফাঁকাভাবে সঠিক ধারণাকে উপস্থিত করে ভ্রা ধারণাকে আক্রমণ করলে কি ভ্রান্তি দূর হয়? বরং বিভ্রান্তিই বাড়ে এবং সুবিধাবাদীরা সুযোগ পায়। কার্য্যক্ষেত্রে তাই দেখা গেছে।

কথাটা মোটেই এই নয় যে নেতৃত্বের অনুমোদিত আত্মসমালোচনা প্রত্যেকটি ছোট বড় বিষয়ে তথ্য বিশ্লেষণ সম্বলিত বিশদ ব্যাখ্যা দিতে হবে অথবা যখন তখন যে কোন বিষয়ে নেতৃত্বের কৈফিয়ৎ তলব করার অধিকার কর্মীদের জন্মে গেছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক, সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রশ্ন: শুধুই বুর্জোয়া ভাববিলাসিতা ও সংগ্রাম বিমুখতা বর্জনের বা সংস্কারবাদ উচ্ছেদের প্রশ্ন নয়। এ এমন একটি প্রশ্ন যার মীমাংসা না হলে সংস্কৃতি আন্দোলন এক পা এগোতে পারে না।

কারণ, প্রকাশ রায় ঠিকই বলেছেন, 'হাওয়ার উপর কোন সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না।' রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথদের নিজ শিবিরে রেখে, "এদেশের প্রথম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব" (রবীন্দ্র গুপ্ত: ৫নং মার্কসবাদী, পৃঃ ১৩৩) সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহকে ইতিহাসের আনুষঙ্গিক প্রগতিশীল ঘটনা মাত্র বলে ধরে নিয়ে, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু ও নজরুলের ধারাকে মূলতঃ একই ধারা বলে জেনে শ্রমিকশ্রেণীর যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন এতদিন চলে এসেছে এখন হঠাৎ কাকে শিবিরে রাখা হবে কাকে রাখা হবে না এবং

কোন বিচারে, এদেশের প্রথম বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক ও শ্রেণী ভিত্তি কি তা না জেনে, সাহিত্যের দুটি বিপরীত ধারা ও কেন পরস্পর বিরোধী তা না বুঝে সে আন্দোলন এগোতে পারে না।

৫নং মার্কসবাদীতে রবীন্দ্র গুপ্ত যেরূপ বিশদভাবে আলোচনা করে বিষয়টি স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন, ৪নং মার্কসবাদীতে এরূপ বিশদ আলোচনাই যে অপরিহার্য্য ছিল তা নয়। একেবারে বিতর্কের উর্দ্ধে তুলে অখণ্ড প্রমাণে প্রামাণ্য করে হাজির না করলে কোন কথাটিই মানবো না এরূপ ছিদ্রান্বেষী কেউ যদি থাকেন, আমাদের সঙ্গে তিনি না থাকলেই আমরা খুসী হব।

কিন্তু সংক্ষেপে নূতন দৃষ্টির মূল কথাগুলি বলে নিয়ে তারপর পুরাণো দৃষ্টিভঙ্গিকে আক্রমণ করা একান্তভাবে জরুরী ছিল। প্রকাশ রায় এটুকুও বলেন নি। ঐতিহ্য সম্পর্কে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি পরিচয়ের 'ঐতিহ্য-বিলাস'কে আক্রমণ করছেন জানিয়ে দেবার চেষ্টা মাত্র না করে সোজাসুজি আক্রমণ সুরু করেছেন—নিছক প্রসঙ্গক্রমে যেটুকু তাঁকে বলতে হয়েছে সেটুকু অবলম্বন করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের উপর!

সংগ্রামের উদ্দীপনাবিহীন নিস্তেজ ঘোষণাপত্রটিকে এইরূপ সংগ্রামের ডাকে গরম করার দাবীতে স্থির থাকার জোর এরা কোথায় পাবেন? মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন এই সব মনগড়া গরম বুলি দিয়ে তো আর 'বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সত্যই লড়তে পারা যায় না।'

মার্কসবাদী, নেতৃত্ব বলেছিলেন:

"খাঁটি লোকদের মনের ইচ্ছা যাই হোক না কেন, সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার যতখানি সদিচ্ছাই তাদের মনে থাকনা কেন, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সেই বিশেষ অবস্থার শ্রেণী-পরিস্থিতি সার্থকভাবে অনুধাবন করতে না পারলে এবং সেই বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে স্লোগান ঠিক করতে না পারলে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে লড়তে পারা যায় না। ঠিক এই আসল কথাটি পাতি বুর্জোয়া বিপ্লববাদীরা হজম করে বসে থাকেন। শ্রেণী বাস্তবতাকে উপেক্ষা করাটা পাতি বুর্জোয়াদের একটা একেবারে সাধারণ ব্যাধি বিশেষ।"

'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' প্রবন্ধে তাঁদের মত সমর্থন করা হয়েছে যাঁরা বলেন, "মজুর কিষাণকে সংঘবদ্ধ করতে মজুর কিষাণ সংগঠকেরা যে কাজ করেন,

শিল্পী সাহিত্যিককেও তা করতে হবে। করতে হবে তা গণসংগ্রামের খাতিরেই নয়—সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মনে রেখেও।"

যদিও দৃষ্টিভঙ্গিতে বুর্জোয়া প্রভাবের আদর্শগত অসচ্ছতার ফলে চিনুবাবু এখানে গণ-সংগ্রামের খাতির ও সাহিত্যের খাতির পৃথক করে ফেলেছেন, মার্কসবাদীর কাছে গণ-সংগ্রাম ছাড়া প্রগতি সাহিত্য কোন কিছুকে খাতির করবে না এটাই সত্য, তবু মূল কথাটা তিনি ঠিকই বলেছেন। গণ-সংগ্রামে যোগ দিতে হলে সাহিত্যিককে গণ-সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেই হবে—সকল ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে সংগঠক হিসাবে সম্ভব না হলেও। কিন্তু এত অল্পে চিনুবাবু সন্তুষ্ট নন। প্রগতিবাদী সাহিত্যিক গণ-সংগঠনে যুক্ত থেকে মজুরচাষীর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে গণ-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবেন এবং সাহিত্যিকের ভূমিকাও বজায় রাখবেন, এ বিধান তাঁর কাছে যথেষ্ট বিপ্লবী ঠেকছে না। তিনি চান বুদ্ধিজীবি শিল্পী-সাহিত্যিক এমন ভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন যাতে দু'চার বছর তুলি কলম তাকে তুলে রাখতে হয়। দু'চার বছর তুলি-কলম চালাতে অপারগ হওয়াটাই তাঁর কাছে সংগ্রামে যথোচিত অংশ গ্রহণের মাপকাঠি। তুলি-কলম চালিয়ে সংগ্রামকে এগিয়ে নেবারও সামর্থ্য বা সময় যদি শিল্পী সাহিত্যিকের রইল, 'দুস্তর ব্যবধান' ঘুচিয়ে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হবার সাধনায় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি শিল্পী-সাহিত্যিক সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছেন, বলা যাবে কি করে!

"তা ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষাণ সভার অবিশ্রান্ত কাজকর্মের ফলে যদি দু'চার বছর লেখা বন্ধও থাকে, তাতেই বা কি এসে যায়। ইতিমধ্যে সেই কাজের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবির মানসিকতার ক্ষেত্রে পলি পড়বেই—আগামী দিনের সোনালী ফসলের যা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। তাই বৈশাখের রুদ্রদাহ দেখে বিহ্বল না হয়ে ভরসা রাখতে হবে আষাঢ়ের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে।"—সাহিত্য ও গণ-সংগ্রাম, পরিচয় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৫৬, পৃঃ ৭১১

দু'চার বছর লেখা বন্ধ থাকলে কি আসে যায় চিনুবাবু অনায়াসেই খেয়াল করতে পারতেন তাঁর দৃষ্টি যদি বস্তুনিষ্ঠ হত, এদেশে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম কোন স্তরে আছে এবং সেই স্তরে শ্রেণী-সম্পর্কের বাস্তবতা কি যদি মনে রাখতেন, বৈশাখ আসার আগেই বৈশাখের রুদ্রদাহ অর্থাৎ সংগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নূতন পর্য্যায় কল্পনা করে বিহ্বল না হতেন। তিনি তাকিয়ে আছেন চীনের দিকে, এদেশের বাস্তবতার দিকে তাঁর নজরই নেই তাই,

চীনের বিশেষ অবস্থায় যা সম্ভব, প্রয়োজনীয় এবং ফলপ্রদ, নির্ব্বিচারে এখানেও তিনি সেই ব্যবস্থা চালাতে চান, সেটা সম্ভব কিনা, সংগ্রামের পক্ষে মারাত্মক কিনা ভাবেন না।

"চীনের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। চীনও আমাদেরই মত অক্ষরজ্ঞানহীন—দারিদ্র্যের প্রচণ্ডতাও এক পর্য্যায়ের। সেখান নবজীবনের উন্মেষে শিল্পী সাহিত্যিকের ভূমিকা সম্পর্কে **রাষ্ট্রনায়ক** মাও সে-তুং অত্যন্ত আস্থাশীল। তিনি বলেছেন আমাদের ফ্রণ্ট দুটোই—**সামরিক** ও সাংস্কৃতিক এবং দুটো পরস্পর মুখাপেক্ষী। কিন্তু ঠিক ফ্রণ্টের মত করেই শিল্পীকে সাহিত্যিককে দায়িত্ব অর্জন করতে হবে—লক্ষ্য স্থির রেখে সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে হবে। **শুনেছি** সেখানে সংস্কৃতি-কর্মীদের দু'তিন বছরের জন্য কিসানের আত্মীয়তা অর্জন করতে যেতে হয়। তার ফলে প্রথমটা সত্যই থেমে গিয়েছিল কলম আর তুলি, কিন্তু অত্যন্ত সাময়িকভাবে। তারপর এসেছে নতুন সৃষ্টির জোয়ার।" (বড়হরফ আমার—লেখক) ঐ, পৃঃ ৭১১।

এ থেকে অত্যন্ত মূল্যবান আসল শিক্ষা আমরা যা পেতে পারি এবং সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজে লাগাতে পারি, যেমন, সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের গুরুত্ব, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পরস্পর মুখাপেক্ষী করা, শিল্পী সাহিত্যিকের কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব অর্জন ও লক্ষ্য স্থির রেখে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা ইত্যাদি, এসব বড় না হয়ে একমাত্র শিক্ষা আবিষ্কৃত হল তুলি ও কলম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার প্রয়োজন! মাও সে-তুং-এর 'রাষ্ট্রনায়ক' এবং একটি ফ্রণ্টের 'সামরিক' এই দুটি বিশেষণ চীন ও এদেশের মধ্যে অবস্থার যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করে—চীনে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র ও সামরিক ফ্রণ্ট আছে, এদেশে নেই—এই সহজ কথাটা খেয়াল করতে ও তার তাৎপর্য্য বুঝতে চিনুবাবু রাজী নন। দু'টি দেশের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানহীনতা ও দারিদ্র্যের প্রচণ্ডতার মিল দেখেই তিনি দুটি দেশের বাস্তবতাকেও মিলিয়ে দিয়েছেন।

চীনের বাস্তবতা কি? যে বিরাট অঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য সেখানে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রতিনিয়ত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও গোপন বিরাট অভিযান শেষ হয়ে গিয়েছে, নূতন সংস্কৃতিকে গায়ের জোরে দমন করার কেউ নেই। সাংস্কৃতিক লড়ায়ের প্রয়োজন অবশ্য এ অবস্থাতে শেষ হয়ে যায় না, বিশেষত জয়লাভের শেষ পর্য্যায়ে এসে পড়লেও বিপর্য্যস্ত জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ যখন পুরাদমে চলেছে—কিন্তু লড়ায়ের রূপ বদলে

ষায়। সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে যে নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টি ও পুষ্টিলাভ তাকে সমৃ করা, গলদ দূর করা, বুর্জোয়া কুসংস্কারের যে সব জেরগুলি নানাভাবে নান কৌশলে ছদ্মবেশে টিকে থাকতে চায় সেগুলি উচ্ছেদ করা। অর্থাৎ মূল প্রধ শত্রুকে শেষ আঘাত হানা এবং আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের সংগ্রাম।

এ অবস্থায় কলম আর তুলি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা, আর এদেশে যে অবস্থা তাতে কলম আর তুলি বন্ধ থাকার মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। অজস্র প্রচারযন্ত্র ও অসংখ্য দালালের মারফতে যেখানে অহরহ বুর্জোয় সংস্কৃতির আফিমের ধোঁয়া ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে জনসাধারণের মগজে বুর্জোয়াকে বিচ্ছিন্ন করা যেখানে শ্রেণীসংগ্রামের প্রধান কায়দা, সেখানে সেই অবস্থায় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণকে কলম ও তুলির সাহায্যে জোরালো করার বদলে কলম ও তুলি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে বলা বামপন্থী বিপ্লববাদেরই নমুনা, সংগ্রামকে বানচাল করতে উপদেশ দেওয়া।

'অবশ্য' রূপ পেছনের দরজা দিয়ে কম্যুনিষ্টদের ভেরস্লাভ সহরের শান্তি সম্মেলনে ঢোকানোর জন্য প্রকাশ রায় চিন্মোহনবাবুকে খোঁচা দিয়েছেন, এর মধ্যে দেখতে পেয়েছেন সংস্কারবাদের আরেক রূপ 'আত্মশক্তিতে অনাস্থা'। 'শুনেছি' রূপ অনির্দ্দিষ্ট অপ্রতিষ্ঠিত জনরবের ভিত্তিতে চিন্মোহন বাবুই যে কম্যুনিষ্টদের সাংস্কৃতিক লড়ায়ের একমাত্র অবশিষ্ট হাতিয়ার কলম ও তুলিকে বাতিল করে আত্মশক্তিতে 'অতি-আস্থা' ঘোষণা করেছেন এটা তিনি দেখতে পান নি। দেখলে তিনি অবশ্যই ধরতে পারতেন, আত্মশক্তিতে এই অনাস্থা এবং অতি-আস্থা কিভাবে পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ করছে, পরস্পরকে টিকে থাকতে সাহায্য করছে।

এই আলোচনা থেকে একটা গুরুতর প্রশ্ন বেরিয়ে আসে—কর্মীদের মজুরচাষীর সাথে কাঁধ মেলাবার প্রশ্ন। এ যেন একটা ফরমুলা দাঁড়িয়ে গেছে যন্ত্রের মত আমরা কথাটা আউড়ে চলেছি। তাই সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে মজুর সংগঠনে লেগে যাবার কথা বলতে আমাদের বাধে না—এতে যে মজুর সংগঠন গড়ে ওঠার বদলে দুর্ব্বল হয়ে যেতে বাধ্য এটা আমরা তলিয়ে দেখি না। সমাজতন্ত্রের জন্য সকল ক্ষেত্রে সব শ্রেণীর মধ্যে কাজ করা, এই ভিত্তিতেই সংগ্রাম শক্তিশালী হয়, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রেণী সম্পর্কের ভিত্তিতে ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের কোন অর্থ আছে কি? এ বিষয়ে লেনিনের অভিমত পরিষ্কার—"তখনকার দিনে (লেনিন এখানে

মোটামুটি ১৮৯৪ থেকে ১৯০১ সালের কথা বলছেন—লেখক) যথার্থই আমাদের লোকবল আশ্চর্য্যরকম কম ছিল এবং কেবলমাত্র শ্রমিকদের মধ্যে যাওয়া হবে স্থির করা ও এই নীতি থেকে বিচ্যুতিকে কঠোরভাবে নিন্দা করা সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক ও সঙ্গত ছিল। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আমাদের স্থান সুদৃঢ় করাই ছিল তখন আমাদের সমগ্র কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমানে বিরাট শক্তিসমূহ আন্দোলনে আকর্ষিত হয়েছে; শিক্ষিত শ্রেণীগুলির যুবসমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে; দেশের সর্ব্বত্র বহু লোক আছেন যাঁরা বাধ্য হয়ে প্রদেশগুলিতে বাস করেন, যাঁরা অতীতে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং এখন যোগ দিতে ইচ্ছুক, এরা সোসাল-ডেমোক্রেসির দিকে এগিয়ে আসছেন (১৮৯৪ সালে সোসাল-ডেমোক্র্যাটদের আঙ্গুলে গোণা যেত)। আমাদের আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ত্রুটি হল এই শক্তিসমূহকে কাজে লাগাতে, এদের যথাযোগ্য কাজ দিতে আমরা অক্ষম (পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব)। এই শক্তিসমূহের অধিকাংশেরই 'শ্রমিকদের মধ্যে যাওয়ার' সুযোগ একেবারে নেই, সুতরাং আমাদের প্রধান লক্ষ্য থেকে শক্তিসমূহ সরিয়ে নেওয়া হবে এ আশঙ্কা ভিত্তিহীন।" —লেনিন, নির্ব্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৯।

দেশে শত শত লেখক আছেন, বুদ্ধিজীবী আছেন, যাঁরা আন্দোলনে যোগ দিতে উৎসুক, কিন্তু শ্রমিকের সঙ্গে কাঁধ মেলাবার, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হবার সুযোগ যাঁদের নেই। এরা কি তবে প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করা থেকে বঞ্চিত থাকবেন, প্রগতিশীল সংস্কৃতিবিদ হওয়ার আশা ত্যাগ করবেন? অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে যোগ দেবার সাধ নিয়েও নিরুপায় হয়ে অগত্যাই বুর্জোয়া শিবিরে থেকে যাবেন? এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে প্রগতি সাহিত্যের সমস্যার মীমাংসা হয় না—যে মীমাংসা হয় তা একপেশে, তা মার্কসবাদ-সম্মত নয়, তা আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার বদলে পিছিয়ে দেয়।

কারণ, এ প্রশ্নের সঠিক মীমাংসার উপরেই নির্ভর করে সংস্কৃতি আন্দোলনকে গণভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। চিন্মোহনবাবু 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম'-এ বলেছেন, এ দেশের শ্রমিকশ্রেণী থেকে গোর্কির মত লেখক উঠে আসা কঠিন। প্রকাশ রায়ও বলছেন: "ধনিকের শোষণ শাসনে শ্রমিকশ্রেণী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার থেকে বঞ্চিত" (৪নং মার্কসবাদী, পৃঃ ১১২)।

এ অতি বাস্তব ও নিষ্ঠুর সত্য। কাজেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী
লেখকদের দিয়ে প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করানো ছাড়া আমাদের
উপায় নেই।

এদিকে শ্রমিকদের মধ্যে না গিয়েও প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব
নয়। বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে যেতে অক্ষম শত শত লেখক
তা হলে বাদ পড়ে যাচ্ছেন—আমাদের শক্তি বাড়ছে না

জোশীবাদ এ সমস্যার মীমাংসা করেছিল! মীমাংসা করেছিল শ্রমিক-
শ্রেণীকে লেজুড়ে পরিণত করে, শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনকে পাতি-বুর্জোয়া
সংগঠনে পরিণত করে, মজুরচাষীকে বুর্জোয়া দৃষ্টিতে দেখে ‘প্রগতি
সাহিত্য’ সৃষ্টির অবাধ অধিকার দিয়ে! আমাদের সে সময়কার সেরা
সৃষ্টি বলে পরিগণিত ‘নবান্ন’ সম্পর্কে প্রকাশ রায় ঠিকই সমালোচনা
করেছেন।

তবে কি জোশীবাদ ছাড়া এ সমস্যার মীমাংসা নেই? শ্রমিকশ্রেণীর
সঙ্গে একাত্ম হতে অক্ষম অথচ প্রগতিবাদী হতে ইচ্ছুক বিরাট এক
লেখকগোষ্ঠীকে বাদ দিয়েই আমাদের প্রগতি সাহিত্যের অভিযান
চালাতে হবে? নিশ্চয় নয়। আমরা সংস্কারবাদটাই দেখছি, সংস্কারবাদ
উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হয়েছি এবং এই দৃষ্টি থেকে মীমাংসা খুঁজছি বলে
সঠিক মীমাংসা পাচ্ছিনা, প্রকারান্তরে জোশীবাদেই জড়িয়ে পড়ছি।

কেবল শ্রমিকশ্রেণীই ষোল আনা বিপ্লবী, বিপ্লব ছাড়া এই শ্রেণীর এমন
কোন স্বার্থই নেই যা তার বিপ্লবী চেতনাকে স্তিমিত করে দিতে পারে।
এ যুগে শ্রমিকশ্রেণীই সবচেয়ে প্রগতিশীল, এই শ্রেণীর বস্তুবাদী জীবন-
দর্শন ও বীরত্বপূর্ণ একনিষ্ঠ সংগ্রামের সর্ব্বাঙ্গীনতা অবলম্বন করেই এ
যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হওয়া সম্ভব: শ্রেণীসংগ্রামের চরম পর্য্যায়ে
প্রগতি সাহিত্য মূলতঃ সমাজবাদী চেতনা ও শ্রেণীসংগ্রামের সাহিত্য।

এই অত্যন্ত সত্য কথাটাকে একটু মোচড় দিয়ে, একটু ঘুরিয়ে নিয়ে
বামপন্থী বিপ্লববাদ প্রগতি সাহিত্যের অভিযানকে আড়ষ্ট করে দিচ্ছে—শুধু
বুর্জোয়া শিল্পরীতি, বুর্জোয়া আঙ্গিক নয়। সংস্কারবাদ বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে
আত্মবিক্রয়ের অভ্যস্ত প্রেরণার জের, কোণঠাসা হয়ে ছদ্মবেশে শ্রমিকশ্রেণীর
প্রতি আমাদের আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত করতে
চায়।

সে মোচড়টা কি? শ্রমিকশ্রেণীর বস্তুবাদী জীবনদর্শনের পরিবর্ত্তে
সমাজবাদী চেতনা ও সকল শ্রেণীর শ্রেণীসম্পর্কগত বাস্তবতার পরিবর্ত্তে,
শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা ও শ্রমিকজীবনের বাস্তবতাকে প্রগতি সাহিত্যের
উপজীব্য বলে দাবী তুলে!

শ্রমিকশ্রেণী ও সংগ্রামের যান্ত্রিক জয়গানের আড়ালে এই বিভ্রান্তি
চাপা পড়ে আছে। শ্রেণী ও সংগ্রাম সম্পর্কিত কয়েকটি সত্যের সঙ্গে
এমন ভাবে মিশে আছে ফাঁকিটা যে এই সত্যের আবরণ ভেদ করে
নজরে পড়া কঠিন। বিশেষতঃ বুর্জোয়া ভাববিলাসিতা ও সংগ্রাম-বিমু-
খতা যখন প্রকট তখন শ্রমিকশ্রেণী ও সংগ্রামকে অত্যন্ত ন্যায্য ও সঠিক
ভাবে তুলে ধরার সাথে বিভ্রান্তিটা মিশে যাওয়ায় নজরে পড়া আরও
কঠিন।

‘সাহিত্য ও গণসংগ্রাম’ প্রবন্ধে আছে: “সাহিত্যক বা শিল্পীর মন
সংঘবদ্ধ মজুর কিষাণের সংস্পর্শে এসে অলক্ষ্যে বিপ্লবী চেতনায় সমৃদ্ধ
হবে—যে চেতনা হল নতুন সাহিত্যের বনিয়াদ। অন্যদিকে শিল্পী
সাহিত্যিক মজুরকিষাণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের
মধ্যেও অলক্ষ্যে সংক্রামিত করবেন সেই তীব্র প্রচণ্ড অনুভূতি যা
হল শিল্পী সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য।”

পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তাতেও বলা হয়েছে
যে ট্রেডইউনিয়ন বা কিষাণসভার অবিশ্রান্ত কাজের ‘মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত
বুদ্ধিজীবীর মানসিকতার ক্ষেত্রে পলি পড়বেই’, যা ভবিষ্যতে সাহিত্যের
সোনালী ফসল ফলাবে।

এই দুই উদ্ধৃতির মাঝখানে চিন্মোহনবাবু লিখছেন: “তবে কি শিল্পী
সাহিত্যিক শুধু মজুর কিষাণের বর্ত্তমান সচেতনতা নিয়েই নিশ্চিন্ত
থাকবেন। নিশ্চয়ই নয়। তিনি বুদ্ধিজীবী হিসাবে সেখানে আনবেন
সোস্যালিষ্ট চৈতন্য, আর তারই ভিত্তিতে তাদের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে
সাহায্য করবেন। কিন্তু সোস্যালিষ্ট চেতনা মজুর কিষাণেরা সহজভাবেই
গ্রহণ করবে শুধু তার আপনজনেরই কাছ থেকে, গুরুমশায়ের কাছ
থেকে নয়।”

অর্থাৎ এক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আসল কথাটা চিন্মোহনবাবুর
অজানা নয়, শ্রেণীসংগ্রাম ও সমাজবাদী চেতনা যে একসঙ্গে বা একটি

অপরটির থেকে উদ্ভূত হয়নি, পাশাপাশি উঠেছে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বাভাবিক চেতনাই যে আসল কথা নয়, আসল কথা তার সমাজবাদী চেতনা এবং এ চেতনা কেবল বাইরে থেকেই তিনি পেতে পারেন—কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানটা প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি আসল কথাটা গুলিয়ে ফেলছেন। 'গোর্কীর মত নিপীড়িত শ্রেণী থেকে সাহিত্যিকের আবির্ভাব এখানে অনেক বেশী কঠিন' এবং 'লেখক ও শিল্পীরা হলেন মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে উদ্ভূত'—এই বাস্তব সমস্যার সঙ্গে মেলাবার বদলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে অতিক্রম করেই বুদ্ধিজীবীর আত্মশোধনের উপায়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন প্রগতি সাহিত্যের বনিয়াদ—মজুর কিষানের সংস্পর্শে আসার ফলে "অলক্ষ্যে" সঞ্চারিত বিপ্লবী চেতনা! সমাজবাদী চেতনা নয়, শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণী সম্পর্কের বাস্তবতা নয়।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যে সংগ্রাম তার শরিক হতে হলে বুদ্ধিজীবীকে শ্রমিক শ্রেণীর আপন হতেই হবে—বুদ্ধিজীবী যতখানি আত্মীয় হবেন শ্রমিকশ্রেণীর ঠিক ততখানিই শত্রু হতে পারবেন বুর্জোয়াদের। কিন্তু তাই বলে প্রগতি সাহিত্যের ভিত্তিও কি স্থির হবে বুদ্ধিজীবীর মুখ চেয়ে, তার খাঁটি বিপ্লবী হবার প্রয়োজনের নিরিখে? প্রগতি সাহিত্যের নিরিখ একটাই, বুদ্ধিজীবী হোন শ্রমিক হোন কিষাণ হোন—সকলের জন্য প্রগতি সাহিত্য স্বষ্টির বনিয়াদ একটাই। শ্রমিকশ্রেণী থেকে যে সাহিত্যিক উঠবেন তিনিও নিছক তার জীবন ও সংগ্রামের রিপোর্ট রচনা করবেন না, সমস্ত শ্রেণীর (বুর্জোয়াশ্রেণীর পর্য্যন্ত) জীবন আর সমগ্র শ্রেণীসংগ্রামই তাঁর সাহিত্যেরও ভিত্তি হবে, কারণ সমাজবাদী চেতনার ভিত্তিও এটাই।

এ বিষয়ে লেনিনের নির্দ্দেশ স্পষ্ট। প্রগতি সাহিত্য স্বষ্টি তো আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র, সমাজবাদী আদর্শ স্বষ্টির কাজেও শ্রমিক কি ভাবে আসবেন? লেনিন স্পষ্টই বলেছেন যে, শ্রমিক জনগণের আন্দোলনের ভিতর থেকে স্বতন্ত্র কোন আদর্শ গড়ে উঠবার প্রশ্নই উঠতে পারে না, সুতরাং হয় বুর্জোয়া নয় সমাজবাদী আদর্শ ছাড়া গত্যন্তর নেই ঃ এবং এই প্রসঙ্গে ফুটনোটে লেনিন বলেছেন—"তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে এরূপ আদর্শ স্বষ্টির কাজে শ্রমিকদের কোন অংশ থাকবে না। কিন্তু তাঁরা অংশ গ্রহণ করবেন শ্রমিক হিসাবে নয়, প্রুধঁ ও ওয়েটলিং-এর মত সমাজবাদী আদর্শকার হিসাবে; অন্য কথায়, বেশী বা কম ঠিক ততখানি অংশই তাঁরা গ্রহণ করবেন তাঁদের

যুগের জ্ঞান যতখানি তাঁরা আয়ত্ত করতে ও সেই জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন ; এবং শ্রমিকেরা যাতে **আরও বেশী করে এটা করতে পারেন** সেজন্য সার্বাঙ্গীণভাবে শ্রমিকদের চেতনার স্তর উন্নত করতে চেষ্টা অতি অবশ্য করতে হবে; বিশেষভাবে দেখতে হবে শ্রমিকেরা যেন '**শ্রমিকদের জন্য সাহিত্যের**' কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত সীমানার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ না রাখেন, বরং আরও বেশী করে **সাধারণ সাহিত্য** পাঠ করেন। 'নিজেদের আবদ্ধ না রাখেন' বলার বদলে 'আবদ্ধ না রাখা হয়' বললেই অধিকতর সত্য বলা হয়, কারণ শ্রমিকেরা নিজেরাই বুদ্ধিজীবীদের জন্য যাহা কিছু লেখা হয় সে সব পড়তে চান এবং পড়েনও এবং মাত্র কয়েকজন (খারাপ) বুদ্ধিজীবীই বিশ্বাস করেন যে কারখানার অবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা হলে এবং অনেক কাল ধরে যা জানা আছে বার বার তার পুনরাবৃত্তি করা হলে 'শ্রমিকদের পক্ষে' তাই যথেষ্ট।"—নির্ব্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ১৭৭।

এদেশের শ্রমিকশ্রেণী শিক্ষাদীক্ষায় বেশী পিছিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু আসল কথা সেটা নয়। সংস্কারবাদী যান্ত্রিকতাই শ্রমিকশ্রেণীকে প্রগতি সাহিত্য গ্রহণ করার স্তরে উন্নত করার বদলে প্রগতি সাহিত্যকে শ্রমিকশ্রেণীর স্তরে নামাবার কথা বলে, এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে দেয় বুদ্ধিজীবীর শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হবার প্রশ্ন। এও শ্রমিকশ্রেণীর দিকে কৃপা ও দরদের দৃষ্টিতে তাকাবার একটা ধরণ—বেচারা মজুর মূর্খ, অজ্ঞ, তাই মজুরমার্কা সাহিত্যের ব্যবস্থা। প্রগতি সাহিত্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে এগিয়ে নেবারই সাহিত্য এবং এই জন্যই এ সাহিত্য মজুরের জীবনপন্থী বা সংগ্রামপন্থী নয়—বুর্জোয়া সাহিত্য যেমন বুর্জোয়াদের জীবনপন্থী নয়।

তার মানে এই নয় যে মজুর কিষাণের জীবন ও সংগ্রাম প্রগতি সাহিত্যে স্থান পাবে না, মানেটা বরং ঠিক বিপরীত। জীবনের রঙ্গমঞ্চে মজুররাই আজ মানবতার ভাগ্যনিয়ন্তা, কিষাণরা সহকারী—এদের বাদ দিয়ে প্রগতি সাহিত্য হয় না বলেই জোর দিয়ে বলা যে রঙ্গমঞ্চটা বাদ দিয়ে বা সঙ্কীর্ণ করে, এদের ভূমিকাচ্যুত করে প্রগতি সাহিত্যে আনতে গেলে এরাই বাদ পড়ে যান।

বুর্জোয়াদের দালাল সাহিত্যিকরা এদের বাদ দিয়েই এদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করে অর্থাৎ মিথ্যা মনগড়া মজুর কিষাণ আনে, শ্রেণী সম্পর্কের সমগ্র

বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মজুর কিষাণ জীবনের বাস্তবতাকে পরিণত কর হীনতা, দীনতা অসহায়তার পশু-জীবনের বাস্তবতায়।

প্রগতিবাদী সাহিত্যিকও শ্রেণী সম্পর্কের রঙ্গমঞ্চ থেকে 'বিপ্লবী' মজু কিষাণকে বিছিন্ন করে দেখবার অসাধ্য সাধনায় আড়ষ্ট হয়ে থাকেন।

৪নং মার্কসবাদীর আত্মসমালোচনায় যে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টি নির্মমভাবে সংস্কারবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে, সে দৃষ্টি এদিকে পড়েনি বলেই অনুরূপ ভুল থেকে গেছে।

"ধনিকের শোষণ শাসনে শ্রমিকশ্রেণী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার থেকে বঞ্চিত—তার অন্তরের আবেগ তাই পুরোপুরি সাহিত্য ভাতহতে পারে না যেটুকুও বা হয় তার উপরেও নেমে আসে শাসকের দণ্ড।" ৪নং মার্কসবাদী পৃঃ ১১২।

"অন্যদিকে যে সব সংস্কৃতিবিদ শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে এসেছেন তাঁরাও পুরোপুরি শ্রেণীবিচ্যুত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি তাই তাঁরাও সে আবেগকে ভাষা দিতে পারছেন না"।

শ্রমিকশ্রেণীর অন্তরের আবেগ বলতে কি বুঝাতে চান প্রকাশ রায় উল্লেখ করেছেন—সাহিত্যভাত যেটুকুর উপর শাসকের দণ্ড নেমেছে। এই সব নমুনা বিচার করে প্রগতি সাহিত্য কিসের রূপায়ণ হবে মোটামুটি আঁচ করা যেতে পারে। 'পরিচয়' ও 'লোকনাট্যের' তুলনামূলক আলোচনাও এবিষয়ে সাহায্য করবে। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা জানি, এভাবে মূলনীতি সম্পর্কিত বিভ্রান্তি দূর হয় না। মূল্যবান্ দৃষ্টান্ত কাজে লাগে না। শ্রমিকশ্রেণীর 'অন্তরের আবেগ'কে সাহিত্যভাত করতে বলা এবং 'শ্রেণীবিচ্যুত' হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হওয়াকে তার সর্ত বলে ঘোষণা করায় বিভ্রান্তি প্রশ্রয় পায় মনে করি।

শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে পা দিয়েও মাথা বুর্জোয়া শিবিরে থেকে যাওয়া অবাঞ্ছনীয় ও অমার্জ্জনীয় নিশ্চয়। কিন্তু পুরোপুরি 'শ্রেণীবিচ্যুত' না হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায় না বা প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না, এ সিদ্ধান্ত মারাত্মক এবং শ্রমিকশ্রেণীর আবেগ বা অনুভূতি সাহিত্যভাত করলে প্রগতিসাহিত্য হয় এই যান্ত্রিক ধারণা থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হয়। বুর্জোয়াদের বহুমুখী ব্যাপক সাংস্কৃতিক আক্রমণ চলতে থাক, শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণকে সমানে বিভ্রান্

করে চলুক, শ্রমিক শিবিরের সংস্কৃতিবিদরা দু'চার বছর কলম তুলি বন্ধ রেখে কেবল মজুর কিষাণের সঙ্গে ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা করুন—এর পিছনেও আছে কিষাণ মজুরের আবেগ বা অনুভূতি ভাল ভাবে আত্মসাৎ করে ভবিষ্যতে একদিন 'উচ্চস্তরের' প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করার যুক্তি।

আবেগ বা অনুভূতিরও শ্রেণীরূপ আছে। কিন্তু সাহিত্য কোন শ্রেণীগত আবেগ বা অনুভূতিরই রূপায়ণ নয়। সাহিত্য শ্রেণীস্বার্থের হাতিয়ার : বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে যেরূপ সমাজব্যবস্থা এই বিশেষশ্রেণী শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল সেই সমাজব্যবস্থাকে স্থাপন করা বা স্থায়ী করার কাজে লাগাই সাহিত্যের মূল কথা বলে সাহিত্য কখনোই একটি শ্রেণীর বিশুদ্ধ আবেগ বা অনুভূতিকে রূপ দেয় না, সমস্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর আবেগ বা অনুভূতি এবং চেতনাকে (অনুভূতি ও চেতনা পৃথক কিন্তু পরস্পর নিরপেক্ষ নয়) প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য একটা সামগ্রিক জীবনদর্শনকেই রূপায়িত করে।

বুর্জোয়াদের দালাল সাহিত্যকেরা শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ বিচ্ছিন্ন করে রূপ দেয়। তার কি চেহারা হয় আমরা ভালভাবেই জানি। বুর্জোয়া শিল্পরীতি কলাকৌশল বহুকাল ধরে শাণিত হয়েছে, তার কায়দা অনেক। বুর্জোয়া সাহিত্যিক যে মজুরকে রূপ দেয় তা কি মিথ্যা শুধু এইজন্য যে সত্যিকারের মজুরের সঙ্গে তার কোন মিল নেই? "সহরতলীতে" যে শ্রমিক ও মালিকের আবেগ—তা দুইই জানা চেনা মাটির পৃথিবীর বাস্তব শ্রমিক ও মালিক থেকে নেওয়া, তবু তা মিথ্যা কেন, প্রতারণা কেন? ধনীর জয়গান নেই, তাকে আঁকা হয়েছে ভণ্ড, প্রতারক মুনাফালোভী করেই, তবু সমগ্রভাবে বিচার করলে বইখানা শ্রমিক স্বার্থের বিরোধী, শ্রমিকশ্রেণীর আবেগের মিথ্যা রূপায়ণ : কারণ, শ্রেণী-সম্পর্কগত বুর্জোয়া সচেতনতা মজুর ও তার আবেগকে শ্রেণী-সম্পর্কের বাস্তবতা থেকে পৃথক করে ফেলেছে। নতুবা, এই বই বুর্জোয়াকে আঘাত করার, তার ভণ্ডামির মুখোশ তুলে ধরার, কিরূপ অপকৌশলে সে ধর্ম্মঘট ভেঙ্গে দেয় তা দেখাবার, মজুরকে মহৎ করে আঁকার ইচ্ছা নিয়েই লেখা হয়।

আসল কথাটা জীবন দর্শন : বুর্জোয়া জীবনদর্শন সাহিত্যকে বুর্জোয়া স্বার্থের অনুকূল করে, শ্রমিকশ্রেণীর জীবনদর্শনই সাহিত্যকে শ্রমিক

স্বার্থের অনুকূল করতে পারে।

শ্রমিকশ্রেণীর জীবনদর্শন ও সকল শ্রেণীর শ্রেণীসম্পর্কগত বাস্তবতা প্রগতি সাহিত্যের ভিত্তি হলে বুদ্ধিজীবীর শ্রেণীবিচ্যুত হবার মত অসম্ভব ও অবাস্তব সর্ত প্রয়োজন হয় না।

লেনিন বলেন ঃ "শ্রমিকদের শ্রেণী রাজনৈতিক চেতনা এনে দেওয়া চলে কেবল বাইরে থেকে, শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্কের সীমানার বাইরে থেকে। একমাত্র যে ক্ষেত্র থেকে এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব তা হল সমস্ত শ্রেণী ও স্তর এবং রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্কের ক্ষেত্র, সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর যোগ সম্পর্কের ক্ষেত্র।"—নির্ব্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪।

সমাজবাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে লেনিন বলেন : "কিন্তু সমাজবাদ এবং শ্রেণীসংগ্রাম উদ্ভূত হয় পাশাপাশি, একটি থেকে অপরটী নয়; প্রত্যেকটী উদ্ভূত হয় বিভিন্ন অবস্থায়। আধুনিক সমাজবাদী চেতনা কেবল গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে।"

—ঐ, পৃঃ ১৭৬।

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজবাদী চেতনা নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন, শ্রেণীবিচ্যুত হবার প্রশ্ন ওঠে না। রাজনৈতিক প্রস্তাবেও মধ্যবিত্ত সম্পর্কে শ্রেণী-বিচ্যুতির নির্দ্দেশ নেই, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার সর্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। বুদ্ধিজীবী যদি শ্রেণীচ্যুত না হয়েও রাজনৈতিক সংগ্রামে নামতে পারেন, সাংস্কৃতিক সংগ্রামে নামতে পারেন না কেন?

সংস্কৃতি ফ্রণ্টে শ্রমিকশ্রেণীরই নেতৃত্ব নিঃসন্দেহ, শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন অগ্রণী অংশ; কিন্তু এ ফ্রণ্টের সৈনিক প্রধানত বুদ্ধিজীবী এবং শ্রেণীচ্যুত না হয়ে প্রধানত তাঁরাই গড়ে তুলবেন নতন সংস্কৃতি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে, সংগ্রামের প্রয়োজনে। শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনে পাতিবুর্জোয়া সংখ্যাধিক্য ঘটলে কি বিপদ হয় আমরা জানি, কিন্তু সে ভয়ে এ ক্ষেত্রে বাস্তবতা অস্বীকার করার বিপদ ডেকে আনবার কারণ নেই, প্রয়োজনও নেই। বুদ্ধিজীবীর দুর্ব্বলতা সম্পর্কে সতর্ক থাকলে, কঠোর হস্তে প্রকাশ্য ও ও ছদ্মবেশী সংস্কারবাদ উচ্ছেদ করলে, শ্রমিক শ্রেণী প্রধানতঃ বুদ্ধিজীবী সৈনিকদের দ্বারাই বুর্জোয়া সংস্কৃতির আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ ও নতুন সংস্কৃতি গড়ার কাজ চালাবেন এবং নিজেদেরও শিক্ষিত করবেন।

বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে সাধারণ ভাবে যান্ত্রিক অশ্রদ্ধা জোশীবাদের প্রতিক্রিয়া। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কোন প্রতিক্রিয়াকেই প্রশ্রয় দেয় না। লেনিন লেখকদের ধিক্কার দিয়াছিলেন, কিন্তু সে শুধু পার্টির বাইরে দাম্ভিক 'মহাপুরুষ' লেখকদের। শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীর সম্পর্ক কিরকম হবে সে বিষয়ে লেনিনের নির্দ্দেশ পরিষ্কার। এ সম্পর্ক হবে শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে শিক্ষা ও জ্ঞানের আদান প্রদানের সম্পর্ক।

লেনিন বলেন, "এই ক্ষেত্রে সর্ব্বহারা, যাঁরা 'কারখানার' স্কুলের মধ্য দিয়ে এসেছেন, এনার্কিষ্ট ব্যক্তিস্ববাদকে একটি শিক্ষা দিতে পারেন এবং তা দেওয়াই উচিত। শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক বহুদিন আগেই সেই শৈশবাবস্থা অতিক্রম করছেন যখন তিনি বুদ্ধিজীবী বলেই তাকে পরিহার করে চলতেন। শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক সোসাল-ডিমোক্রেটিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে সমৃদ্ধতর জ্ঞানভাণ্ডার ও বিস্তৃততর রাজনৈতিক দিগন্তসীমার সন্ধান, পান তা মূল্যবান গণ্য করেন।"—ঐ পৃঃ ১৩৩

এই প্রসঙ্গে লেনিন বুদ্ধিজীবীর মনোবৃত্তি সর্ব্বহারার সংগ্রামের সৈনিকের মনোবৃত্তি অথবা বুর্জোয়া মনোবৃত্তি এবিষয়ে শ্রমিককে বিচারশীল হতে উপদেশ দিয়েছেন। সেটাই আসল কথা, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীবিচ্যুত কিনা সে বিচার নয়।

নতুবা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী যাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর সাথে লড়াইয়ে নেমেছেন এবং নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে ইচ্ছুক তাঁদের নিষেধ করে দেওয়া হয় যে সংস্কৃতি চর্চ্চা তোমাদের কাজ নয়। এ শুধু শ্রমিকে-পরিণত বুদ্ধিজীবীর কাজ।

ছাত্র কেরাণী শিক্ষক অধ্যাপক প্রভৃতি যাঁরা তাঁদের 'ভবিষ্যৎ যে শ্রমিকের শ্রেণীচেতনাতে' এটা বুঝে উঠতে পেরেছেন, নিজের নিজের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে নামছেন, কিন্তু যাঁদের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যাওয়ার সুযোগ নেই, সংস্কৃতি সৃষ্টি চেষ্টা করার অধিকারও তাঁদের থাকছে না।

"মধ্যবিত্ত সমাজ ভেঙ্গে আজ মজুরের সঙ্গে সমতল হয়ে উঠবার উপক্রম করেছে, অতীতের স্বদেশভক্তির আদর্শ আর নূতন শ্রেণী-চেতনা তার অন্তরে ও বাহিরে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত করেছে, তার ভবিষ্যৎ যে শ্রমিকের শ্রেণী-চেতনাতে তা বুঝি বুঝি করেও বুঝে উঠতে পারছে না, কংগ্রেসী আদর্শ বার

বার তাকে পিছনে টানছে।" —বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা, ১ন
মার্কসবাদী, পৃঃ ৯০।

সময়টা অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্ত্তনের। একথা যে সময় লেখা হয় তারপর
সংকট তীব্রতর হয়েছে, লড়াই ব্যাপকতর ও প্রচণ্ডতর রূপ নিয়েছে, বুঝি বুঝি
করেও না বুঝে উঠতে পারার ভাব থেকে মধ্যবিত্ত অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে।
প্রগতি চর্চ্চার জন্য বহু নূতন সংঘ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, পত্রিকা বার হচ্ছে,
পুরানো অনেক প্রতিষ্ঠান ঝুঁকছে প্রগতির দিকে। শ্রমিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না
হলেও প্রাসাদবাসী বিমানচারী বুর্জোয়ার চেয়ে শ্রমিক এদের ঢের বেশী জানা
চেনা মানুষ, শ্রমিকের শ্রেণী-চেতনাই এরা কম বেশী গ্রহণ করছেন, কংগ্রেসী
আদর্শ বিষবৎ হয়ে গেছে। সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজের নয়, কিন্তু ঝোঁকটা এই
দিকেই।

এদের প্রগতি সাহিত্য, শ্রমিকের জীবনদর্শনের রূপায়ণ কাঁচা হতে বাধ্য।
কিন্তু সেজন্য যদি আমরা নাক সিঁটকাই, সাহিত্য-সৃষ্টির এ ব্যাপক
প্রচেষ্টাকে বাতিল করি, সেটা বুর্জোয়া ভাবাদর্শের খপ্পরে গিয়েই পড়া হবে,
প্রগতি সাহিত্যের যে জোয়ার আসছে তাকে বানচাল করা হবে।

রণক্ষেত্র সর্ব্বত্র প্রসারিত, তীব্র প্রচণ্ড সংগ্রাম, বুর্জোয়া-বিরোধী বিক্ষোভ
যেখানে যেভাবে ফেটে পড়ছে সমস্তই শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের অঙ্গ:
শ্রমিকের আদর্শে কাঁচা পাকা নরম গরম সাধারণ অসাধারণ এবং বিচিত্র ও
বিভিন্নরূপে ছড়ানো আগুনের মত সাহিত্য উঠে কংগ্রেসী আদর্শের ভিত্তি
ছারখার করে দেবে—এই গণ-সাহিত্যই শ্রমিককেও উদ্বুদ্ধ করবে। শ্রমিকের
আবেগ বিপ্লবী সাহিত্যের অবলম্বন, গোর্কিদের দিয়ে ছাড়া বিপ্লবী সাহিত্য হয়
না ধরে নেওয়ার অর্থ গোর্কিদের উঠবার বাস্তব প্রক্রিয়াকেই বাতিল করে
দেওয়া।

তাছাড়া, গোর্কির রচনা পড়ে স্পষ্টই দেখতে পাই তা নিছক মজুর নিয়ে
শ্রেণী-সঙ্কীর্ণ রচনা নয়, মজুরের জন্য, 'সহজিয়া' সৃষ্টি নয়, শ্রমিকের বিপ্লবী
চেতনা গোর্কির সৃষ্টির প্রাণবস্তু, এটাই শ্রমিক জীবনের বাস্তবতাকে এমন মর্ম
দিয়েছে যা সকল মানুষের চেতনাকে প্রভাবিত করে।

বুদ্ধিজীবীদের জন্য রচিত সাধারণ সাহিত্যই শ্রমিকেরা বেশী বেশী করে
পড়বেন, লেনিনের একথার তাৎপর্য্য ভুলে যাওয়ায় আমরা কার্য্যতঃ প্রগতি
সাহিত্যের বিকাশকে ব্যাহত করছি।

প্রথমতঃ শ্রমিকশ্রেণীর নামে শ্রেণী-সঙ্কীর্ণতার ভিত্তিতে কৃত্রিম প্রগতি সাহিত্য দাবী করে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের অগ্রণী সৈনিক সাহিত্যিকদের পাকা প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসকে আড়ষ্ট করে দিচ্ছি। মজুর কিষাণের সঙ্গে একাত্ম হয়েও সাহিত্যের ভিত্তিটা কি হবে এ বিষয়ে ভুল ধারণা আঁকড়ে থাকায় তাঁদের সাধনা সার্থক হচ্ছে না; আত্মশক্তিতে অনাস্থা জন্মাচ্ছে। এদের সৃষ্ট পাকা সাহিত্যের প্রভাবে ও অনুকরণে শত শত তরুণ উৎকর্ষের নানা স্তরের কমবেশী কাঁচাপাকা প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করতে লেগে গিয়ে বিপ্লবী সাহিত্যের দুর্বার জোয়ারটি সৃষ্টি করতে উদ্যত উৎসুক হয়ে আছেন, তাঁরাও পথ হাতড়াচ্ছেন।

সাহিত্যের জোয়ার এভাবেই সৃষ্টি হয়—কয়েকজন সেরা সাহিত্যিকের সেরা সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই লিখিত না হলে—শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির চেয়ে কম ভালো, মাঝারী, নীচুস্তরের প্রভৃতি অজস্র সাহিত্য না জন্মালে—সাহিত্য সামাজিক শক্তি বলে গণ্যই হত না। বুর্জোয়া সাহিত্যের দিকপাল এবং প্রধান মুখপত্রই শুধু বিকৃত চিন্তা ছড়ায় না, নানা দরের বহুসংখ্যক লেখক ও পত্রিকাও এই বিকৃতি ঘরে ঘরে পরিবেশন করে, অপটু বাজে সৃষ্টিও বুর্জোয়া প্রচারে ফেলনা নয়।

আমরা 'বিশুদ্ধ প্রগতি সাহিত্য', 'উচ্চশ্রেণীর প্রগতি সাহিত্য' দাবী করি, অপটু সাহিত্য প্রচেষ্টা দেখে নাক সিঁটকাই, গণ-সংগ্রামের ব্যাপকতা ও তীব্রতা নূতন সাহিত্য সৃষ্টির যে ব্যাপক উদ্দীপনা জাগিয়েছে বুদ্ধিজীবী সমাজে ব্যাপকভাবে যে অপটু প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে সাহিত্য সৃষ্টির, তাকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করার বদলে উদাসীন হয়ে আছি। অথচ এই বিচ্ছিন্ন ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাকে বুর্জোয়া আদর্শের খপ্পরে গিয়ে পড়ার বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য, সুগঠিত ও শ্রমিকের আদর্শে সুদৃঢ় করার জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ এবং সে দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই পাকা প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। শুধু মজুর কিষাণের সাথে সংস্কৃতি সৃষ্টির খণ্ডিত পরিকল্পনা সার্থকও হতে পারে এই সমন্বয়ের দ্বারাই।

এ কি জোশীবাদের সঙ্গে আপোসের পরামর্শ, অন্ততঃ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে? মোটেই তা নয়। শ্রমিকশ্রেণীর দিকে পিছন ফিরে সংস্কৃতি আন্দোলনে পাতিবুর্জোয়া নেতৃত্বের কথা হলে সে ঝুঁকি থাকত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে এরূপ ইঙ্গিতও নেই। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই রাজনৈতিক

আন্দোলনের মত সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত স্তরে প্রসারিত করা, মজুর কিষাণের স্তরে খণ্ডিত করার ঝোঁকটা সংশোধন সংস্কৃতির চাষে বিশেষ উপযোগিতার দরুন বুদ্ধিজীবী সৈনিক' ও সৈনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের দিয়েই প্রধানতঃ ফসলটা ফলানোর ব্যবস্থা। লেনিনের মতে, এরূপ ফসলই শ্রমিকের উপযোগী ও প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, আঙ্গিক সহজ হবে, আঙ্গিকের বিশেষ মূল্য নেই এই ধারণাও প্রগতি সাহিত্যকে ব্যাহত করছে। আত্মসমালোচনায় ঠিকই বলা হয়েছে যে 'বুর্জোয়া শিল্পরীতি, বুর্জোয়া আঙ্গিক প্রগতি চিন্তাকে আড়ষ্ট করে দিচ্ছে'। অধ্যাত্মবাদ, রহস্যবাদ, দুঃখবাদ ইত্যাদির জন্য যে আঙ্গিক, আঙ্গিক-সর্ব্বস্বতার সাহায্যে এলোমেলো অর্থহীন চিন্তা নিয়ে উচ্চ চিন্তার ভাওতা সৃষ্টির জন্য যে আঙ্গিক, বলিষ্ঠ সংগ্রামী বস্তুবাদের তা কোন কাজেই লাগতে পারে না। এই আঙ্গিক-প্রীতি নিঃসন্দেহে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রতি আনুগত্য, সংস্কারবাদ।

কিন্তু সোজা সহজভাবে বিপ্লবী ভাবচিন্তাকে প্রকাশ করার আঙ্গিকই প্রগতি সাহিত্যের আঙ্গিক হবে, একথা বলাও বুর্জোয়া-প্রতিক্রিয়া, ছদ্মবেশী সংস্কারবাদ। এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে দু'ভাবে, বুর্জোয়া আঙ্গিক-সর্ব্বস্বতার প্রতিক্রিয়ায় আঙ্গিককেই বাতিল করতে চাওয়ার ঝোঁক এবং অজ্ঞ অশিক্ষিত মজুর কিসানের সহজিয়া সাহিত্যই কেবল গ্রহণীয় এই লেনিনবাদ-বিরোধী যন্ত্রিকতা থেকে।

৪নং মার্কসবাদীর আত্মমালোচনায় গণনাট্য সংঘের জন্য স্বরপতিবাবুর উপস্থাপিত কার্য্যসূচীর সমালোচনা প্রসঙ্গে কার্য্যতঃ এরূপ ধারণাকে সঙ্গত ভাবেই বাতিল করা হ'য়েছে। "যাত্রাদল, কবিয়াল ইত্যাদির মধ্যেই তিনি 'নতুন সৃষ্টি ও স্রষ্টার' সম্ভাবনা খুঁজবেন—আন্দোলনের মধ্যে নয়, 'নিরক্ষর শ্রমিক কৃষকের মধ্যে নয়।" (পৃঃ ১৩৯), আন্দোলন বাদ দিয়ে, শ্রমিক কৃষক বাদ দিয়ে যাত্রাদল কবিয়ালের আঙ্গিকে নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টির ধারণা কিরূপ মারাত্মক, প্রকাশ রায় সে বিষয়ে সচেতন। কিন্তু সংস্কারবাদের আংশিক রূপ ধরে এই আত্মসমালোচনা বলেই শুধু প্রসঙ্গক্রমেই এটুকু বলা হয়েছে, যাত্রাদল কবিয়ালের প্রতি এই পক্ষপাতিত্বের গোড়া খুঁড়ে সংস্কার-বাদের চোরা-চেহারার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করা হয় নি। তাই আত্মসমালোচনাতে এই বিভ্রান্তিকর ধারণা ঠাঁই পেয়ে গেছে।

"হাঁ, এইটাই সত্যকারের গণ-সংস্কৃতি রচনার পথ। গণ-সংস্কৃতি রচনা নিভৃত সাধনা নয়—সে সংস্কৃতি রচিত হবে লড়াইয়ের ময়দানে, বুর্জোয়া শ্রেণীর ধ্বংসস্তূপের উপর। আর এর চেতনাই দিয়েছে 'লোকনাট্য'কে ইস্পাতের তীক্ষ্ণতা। প্রবন্ধ কবিতা থেকে পত্রিকা প্রসঙ্গ সর্বত্রই রয়েছে এই সংগ্রামশীল চেতনার ছাপ। আর তাই তো, 'লোকনাট্যে'র লোককবি সহজ কথাকে সহজ করেই বলতে পেরেছেন :

> নির্ব্বিচারে নরনারী ছাত্রছাত্রী হত্যা
> এই যদি হয় শিশুরাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা
> তবে আমি সভার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি
> পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী।

বিষ্ণু দের মত তথাকথিত ভদ্র কবিরা রচনা করুন তো দেখি এমন কবিতা, তাঁদের মুরোদ বুঝি। কিন্তু বিষ্ণুবাবুদের তা সাধ্যাতীত—কোথায় পাবে বুর্জোয়াদের বশংবদ সংস্কৃতিবিদেরা এই প্রাণশক্তি?"—৪নং মার্কসবাদী, পৃঃ ১৪০।

এমন কবিতা লেখা শুধু সাধ্যাতীত নয়, বিষ্ণুবাবুদের কল্পনাতীতও বটে। তাঁদের পেশাই হল ফাঁকিবাজী, ফাঁকির শূন্যকে আঙ্গিকের ফাঁকা চটকে মুড়ে লোক ঠকানো। কিন্তু এদের উপর রাগ করে গ্রাম্য ছড়ার ধীর স্তিমিত সাদাসিদে শিল্পরীতিকেই প্রগতি সাহিত্যের বড় গুণ বলে তুলে ধরব? বুর্জোয়াদের বংশবদ সংস্কৃতিবিদরা চুলোয় যাক—প্রগতিবাদী সংস্কৃতির আঘাতে চুলোয় তারা যাবেই, তাদের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বার্দ্ধক্যজনিত হতাশা আতঙ্কে মার্কিন পদলেহী এবং সংকট এড়াতে অক্ষম প্রভুরাই শ্রমিকশ্রেণীর উদ্যত উদ্ধত আঘাতে চুলোয় যাচ্ছে—কিন্তু গ্রাম্য ছড়ার নরম ও সহজ আঙ্গিক ছাড়া গতি নেই, প্রগতি সাহিত্যের এ দৈন্য ঘোষণা তো এর সঙ্গে খাপ খায় না।

এ কবিতার আঙ্গিক মূলত পুরাণ ও পাঁচালীর আঙ্গিক—অতীতের সংগ্রামহীন শান্ত ও মন্থরগতি গ্রাম্য জীবনের আবেগ-চেতনা রূপায়ণের উপযোগী। এই আঙ্গিকে কোন্দল সুন্দর রূপ পায় কিন্তু সংগ্রামের রূপায়ণ এক রকম অসম্ভব : রামায়ণ মহাভারতে যুদ্ধের বর্ণনা তাই হাস্যকর রকমে একঘেয়ে ও ব্যর্থ; রামায়ণের যুদ্ধের একটী ঘটনা নিয়ে মাইকেলের নূতন চিন্তা 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সম্পূর্ণ নূতন আঙ্গিকেই সার্থক অভিব্যক্তি

লাভ করতে পেয়েছে। অভাব ও শোকদুঃখ বেদনা ছড়ায় গভীরতা পায়, গ্রামের জীবনে এ অভিজ্ঞতার অভাব নেই—কিন্তু প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের তীব্রতা থাকে না বলেই ছড়ায় শোকদুঃখের বর্ণনা গভীরতা পায়। আবেগ-চেতনার তীব্রতা ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না।

শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত জনসাধারণের জটিল তীব্র যুগান্তকারী সংগ্রামের কয়েকটা সাধারণ সত্য উক্ত কবিতায় সহজ ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এও বিদ্রোহের কবিতা নিঃসন্দেহ, এ কবিতাতেও আগুন আছে—কিন্তু আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের আগুন এখানে হয়েছে গ্রাম্য হুকোর টিকের আগুন।

তাই বলে কি এ কবিতা বর্জনীয়? পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার নয়। বিষ্ণু দের বরফের টুক্‌রোর তুলনায় টিকের আগুনও আমাদের কাছে মূল্যবান।

কথাটা হল আঙ্গিকের। আমার মতে, প্রগতি সাহিত্যের আঙ্গিক এখনো জন্মেনি, জন্মাচ্ছে—নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রচেষ্টার মধ্যেই জন্মাচ্ছে। বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতির প্রাণবস্তু যেমন হবে সম্পূর্ণ নতুন, আঙ্গিকও হবে তেমনি নতুন—কারো সাধ্য নেই আজ বলে দেয় সে আঙ্গিক কি হবে। বলতে গেলেই বরং ক্ষতি হবে—বিপ্লবী আবেগ চেতনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে যতদূর সম্ভব তীব্র তীক্ষ্ণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার বদলে আঙ্গিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ঝোঁক আসবে।

—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পাব্‌লো নেরুদা

'কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান'—এই কবিতার বইটি ১৯২৪ সালে প্রথম ছেপে বেরলো; বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বইখানি কবিতার সমস্ত সমঝদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল চিলির এক অখ্যাত লেখকের দিকে; ইনি নিজের পরিচয় দিতেন পাব্‌লো নেরুদা নামে। কবির কয়েকজন অন্তরঙ্গই কেবল জানতেন যে, এটা হচ্ছে টেমুকোর অধিবাসী নেফ্‌টালি রিকার্ডো রেইসের-এর ছদ্মনাম; বয়স তাঁর মাত্র কুড়ি বছর এবং তিনি কাব্য-জগতে প্রবেশ করেছেন ১৯২১ সালে ছোট একখানি কাব্য-সঙ্কলন নিয়ে।

ল্যাটিন-আমেরিকান (দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশগুলোর ভাষা ল্যাটিন জাতীয়—অ) কবিতার সেটা এক যুগ থেকে আর-এক যুগে উত্তীর্ণ হবার মাঝামাঝি অবস্থা। 'আধুনিকতাবাদ' নামে সাহিত্যিক ধারার শেষ বড় প্রতিনিধি রুবেন দারিও মারা গেলেন ১৯১৬ সালে। তিনি ছিলেন এমন এক কবি যিনি ভার্লেইনের জরাগ্রস্ত বিষণ্ণ সুরধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন নিকারাগুয়ার ঝাঁঝরের উল্লাস-মুখর সঙ্গীত। রুবেন দারিও-র মৃত্যুর পর নানা সাহিত্যিকগোষ্ঠী ও দল অতীতের কাব্যের পাথরের মতো প্রাণহীন ও কঠিন প্রতীক এবং গতানুগতিক আবেগ সমেত সেই কাব্যকেই চালিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কেউ বা প্যারিসের সবচেয়ে নতুন চালচলন অনুসরণ করলেন উৎসাহের সঙ্গে, কেউ বা আবার স্থানীয় 'মতবাদ' উদ্ভাবন করলেন; কিন্তু এই সব জিনিস অবাস্তব কথার ভোজবাজির মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারল না; পারল না 'মার্কুইস', 'রাজহাঁস', 'বীণা' এবং কাব্যের অন্য সব পচা পুরানো ঠাটঠমককে ঘসে মেজে পালিস করে বাজারে চালু করতে।

'কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান' বইখানিতে কোন আড়ম্বর ছিল না; কিন্তু যারা এ-বই পড়ল তারাই বুঝল যে, এমন একজন কবির জন্ম হয়েছে যিনি বাঁধা-ধরা নিয়ম থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন, নিজের পথ খুঁজে বার করে নিতে পারবেন ঃ

ঝোড়ো-হাওয়ায় জীবন্ত-হ'য়ে-ওঠা
ভরা বসন্তের একটি সকাল,—

মেঘগুলো হাওয়ায় উড়ছে
বরফের মতো সাদা বিদায়বেলার রুমালের মতো!
আমাদের শান্ত-নীরব ভালোবাসার উপর
বাতাসের ঝাপটাগুলো যেন হাজার বুকের দপদপানি।

* * *

পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় যে তার বুকের ভয়,
কানা হয়ে-যাওয়া ডুবুরির দুরন্ত দুঃসাহস,
আর ভালোবাসার থমকে-থাকা উল্লাস,—
সব এসে মিলেছে তোমার ভেতর···
যাবার সময় হোলো। এলো বিদায়ের সেই কঠিন শীতল লগ্ন
যে-লগ্নের ছাপ রেখে যায় রাত্রি
কালের যাত্রার বুকে···
পরিত্যক্ত আমি, সকাল বেলায় রাতের আশ্রয়ের মতো পরিত্যক্ত···
যাবার সময় হোলো, চলে গেছ তুমি আমাকে ফেলে।

গোড়ার দিককার এই বইটি থেকে আমি এই কয়েকটি লাইন তুলে দি
এই কারণে যে, এদের ভিতরে ইতিমধ্যেই পাব্‌লো নেরুদার শিল্পের কয়েক
বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। সেগুলি হচ্ছে,—প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সংযোগ, তাঁ
কবিতার ভিতরকার চিত্রগুলির সজীবতা, তাঁর কণ্ঠস্বরের পরিপূর্ণতা।

কবির জন্মের কথা বলবার সময় তাঁর সাহিত্যিক বংশক্রম ও গোত্রে
উল্লেখ করাটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাষ্টিলিয়ান কবিতার মহা
অতীত পাব্‌লো নেরুদা আয়ত্ত করেছিলেন। ফ্রান্সের "অভিশপ্ত কবি"দে
প্রধানত বোদ্‌লেয়ার ও আর্থার রিম্বোর কাব্য এবং ভাবগত উত্তরাধিকা
তিনি ঘৃণাভরে অবহেলা করেননি। চিলির লোক-কাব্য এবং চারণদে
উদ্দীপনাময়ী ভাবধারা তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। এই সব চারণদের মধ্যে
সবচেয়ে বিশিষ্ট হচ্ছেন আধুনিক 'রোমান্সেরো'র জনক জিসাস ব্রিটো; ইনি
সম্প্রতি মারা গেছেন (ব্রিটোর উদ্দেশে উৎসর্গ-করা একটি চমৎকার কবি
আছে পাব্‌লো নেরুদার)। সে যাই হোক, পাব্‌লো নেরুদার শিল্পী হিসা
গড়ে ওঠার পথে সব চেয়ে বেশী প্রভাব পড়েছে বিদেশী অন্য দুই কবির।

পাবলো নেরুদা বলছেন: "আমাদের তরুণ বয়সে আমরা মায়াকোভ্‌স্কি

কণ্ঠস্বরে চমকিত হয়েছিলাম। জরাজীর্ণ কাব্যের রীতিনীতি, উষা ও প্রত্যূষের চুলচেরা বিচারের মধ্যে ধ্বনিত এক নতুন কণ্ঠস্বর; তার আওয়াজটা যেন রাজমিস্ত্রির হাতুড়ির শব্দ। সমষ্টির হৃদয়ের দিকে কবি তাঁর দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন; সেখানে খুঁজে পেয়েছেন শক্তি তাঁর নতুন গানের জন্যে। আমাদের যুগের কাব্যে মায়াকোভস্কির শক্তি, কোমলতা ও প্রচণ্ডতাকে আজও পর্য্যন্ত কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।"

মায়াকোভস্কির কবিতার মধ্যে কোন্ জিনিস পাব্‌লো নেরুদার মনে রেখাপাত করেছিল? সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার মধ্যেই মায়াকোভস্কি তাঁর কবি-জীবনের পরম লক্ষ্য উপলব্ধি করেছিলেন। এই নবনির্ম্মাণের সুতীব্র প্রেরণা—এক মহৎ ভাবের ভাগ্যের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত ভাগ্য একসঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া—মায়াকোভস্কির এই বৈশিষ্ট্যই পরবর্ত্তী কালে নেরুদাকে আকর্ষণ করেছিল, একথা আমরা জানি। পাব্‌লো নেরুদা কিন্তু লিখেছেন যে, মায়াকোভস্কি বহু পূর্ব্বেই তাঁর তরুণ বয়সেই তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা' ও 'পৃথিবী পরিক্রমা'র লেখক তখনও সামাজিক বাণীর কাব্য থেকে অনেক দূরে ছিলেন। মায়াকোভস্কি তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন প্রধানত তার স্পষ্টতার জন্যে তাঁর গতানুগতিকতা বর্জ্জনের দ্বারা, তাঁর বজ্রের মতো কণ্ঠস্বর দিয়ে, তার 'শক্তি, সংবেদনা ও প্রচণ্ডতা' দিয়ে।

মায়াকোভস্কি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে পাব্‌লো নেরুদা বলেছেন, "হুইট্‌ম্যান তাঁকে পছন্দ করতে পারতেন।"

তিনি এই দু'টি নাম হঠাৎ পাশাপাশি রাখেননি। "ঘাসের গুচ্ছে"র কবির জীবনসম্ভোগের অদম্য আনন্দ, তাঁর কবিতার ভিতরকার চিত্রগুলির ঐশ্বর্য্য আর জীবন্ত ঐক্য, সর্ব্বোপরি সমস্ত রকমের বাঁধাধরা নিয়মের প্রতি তাঁর বিরাগ ও ঘৃণা, এবং তাঁর কাব্যের মুক্ত ছন্দ—চিলির তরুণ কবিকে এ-সব যতই সাহায্য করে থাকুক না কেন, নিজেকে খুঁজে পেতে, তবুও পাব্‌লো নেরুদা সোভিয়েট কবির মতামতের সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্য এক যুগের কবির মতামতকে যে এক করে দেখছেন না সেকথা না বললেও চলে। ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের প্রতি তাঁর অনুরাগ তিনি বজায়ই রেখেছিলেন। তাঁর সাম্প্রতিক একটি কবিতায় তিনি হুইট্‌ম্যানকে তাঁর "জ্ঞানী ভ্রাতা" বলে সম্বোধন করে বলেছেন:

আমাকে দাও তোমার মুখের ভাষা আর বুকের বোঝা……

বহু বছর কেটে গেল। নেরুদা কূটনৈতিক দফ্‌তরে চাকুরিতে ঢুকলেন, জাহাজে জাহাজে সাগর পাড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ালেন, দেখলেন নানা দেশ। তাঁর কাব্যকৌশল পরিণতি লাভ করল, তাঁর খ্যাতি পড়ল ছড়িয়ে। তবু কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর হ'তে লাগল। তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি তখন 'মৃত্যুর অভিধান' পড়ছিলেন।

পাব্‌লো নেরুদার শিল্পের এই যুগ সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে আমি নিজেকে প্রশ্ন করে থাকি : যে-লোক জীবনকে এত প্রাণ দিয়ে ভালবাসত, সে কেন তার সামনে দেখত মৃত্যুকে? ওটা একটা সাহিত্যিক মোহান্ধতা—এই বলে একথার কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না : প্রতীকবাদের শেষ 'এপিগোনির' মোমের পুতুলের খেলো প্রদর্শনীর পথ তিনি কখনো মাড়াননি। তিনি বলেছেন :—"যা আমি দেখি, কেবল তা-ই লিখে থাকি। আবিষ্কারের হাত থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।" দ্বিতীয় দশকের শেষ ভাগ এবং তৃতীয় দশকের প্রথম ভাগে পাব্‌লো নেরুদার কাব্যে মৃত্যু ছিল বাস্তব—এ সেই জগতের মৃত্যু যা তাঁর চারপাশে তিনি দেখতেন, যার সঙ্গে হাজারো রকমের বাঁধনে তিনি ছিলেন বাঁধা। তাঁর কণ্ঠস্বর যতই পরিপূর্ণ এবং জোরালো হয়ে উঠতে লাগল, ততই তাঁর মধ্যে শোনা যেতে লাগল মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি; একে তিনি নিজেই বলেছেন, "মৃত্যুর ফেকাশে জড়পিণ্ড।"

শূন্যতাবোধ থেকে জন্মানো একাকীত্ব, জনগণ আবেগ এবং এমন কি বস্তুর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর জটিলতা পাব্‌লো নেরুদাকে বাধ্য করল একটা বিচিত্র দুরূহ ভাষার সাহায্য নিতে, এমন সব অনুষঙ্গের আশ্রয় নিতে যা বস্তুত ব্যাখ্যা করে বোঝানোই যায় না; তাঁকে বাধ্য করলো কথাগুলো এমন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লিখতে যা প্রায়ই পাঠককে হতবুদ্ধি করে দেয়; এবং যা দেখে ছুঁচোর চলার ভঙ্গীই মনে পড়ে। তাঁর কবিতা সম্পর্কে বলা হ'তে লাগল যে সেটা এমন ভাবে ছিপি-আঁটা যে তার মধ্যে হাওয়া ঢুকতে পারে না, তার না আছে তল, না আছে পার। নেরুদার কাব্য এবং ষ্টাইল সম্পর্কে আমাডো আলোনসো একটা বই লিখেছিলেন। তার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'অতল কাব্যের কৈফিয়ৎ'। একথা অবশ্য বলতেই হবে যে সে যুগেও পাব্‌লো নেরুদার বিরাট শক্তি ও আবেগ তাঁকে সেই 'অতল গভীরতা'র হাত থেকে বাঁচিয়েছিল যা তাঁর নিজের কাছেই ছিল একটা অভিশাপ এবং যার আড়ালে অন্য ছোট কবিরা

তাঁদের আত্মিক দৈন্য ঢেকে রাখতেন। তাঁর জটাপাকানো কবিতাও লোকের মর্ম্ম স্পর্শ করল, তার বেদনার নিদারুণ আবেগও হৃদয়ের গভীরে পর্য্যন্ত গিয়ে নাড়া দিল।

আমেরিকা ও স্পেনে পাব্‌লো নেরুদার বন্ধুরাও মৃত্যুর কথাই লিখছিলেন। জর্জ্জ ম্যানরিক পঁচিশ বছর আগে মানুষ ও মৃত্যুর মধ্যে যে কথোপকথন শুরু করেছিলেন, মনে হ'ল ক্যাষ্টিলিয়ান কবিতা বুঝি তাই চালিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর উপর ঝড়ের মেঘ ঘনিয়ে উঠল; ফাশিষ্টরা বার্লিনে বই পোড়ালো, আস্তুরিয়াসে খনি-মজুরদের গুলি করে মারল। পাব্‌লো নেরুদা এই ট্র্যাজেডির উদাসীন দর্শক ছিলেন না; তবু কিন্তু সে সময় তাঁর কাছে সামাজিক বোধের দিন এবং অনুপ্রেরণার রাত ছিল দুটো আলাদা জগৎ। তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর মধ্যে কিছু একটা মরে যাচ্ছে, এবং তাই নিয়ে এত গভীরভাবে এবং এত চমৎকার করে তিনি লিখলেন যে তাঁর কথা শুনতে শুনতে অনেকে ভুলেই গেল সেই বাস্তব মৃত্যুকে যা তখন ধীরে ধীরে বিভিন্ন জাতিকে আচ্ছন্ন করছিল। সম্প্রতি ফরাসী কবি লুই আরাগঁ লোকগীতির ধরনে তাঁর 'পাব্‌লো নেরুদার গান' রচনা করেছেন। তৃতীয় দশকের গোড়ার দিক্‌কার সময় সম্পর্কে আরাগঁ বলছেন :

শুনতে পাইনি, শুনতে পাইনি আমি
কুচকাওয়াজী সৈন্যদের ভারী পায়ের শব্দ,
পাব্‌লো নেরুদার গানের জোয়ারের উদ্দাম কল্লোলে।

সেই আচ্ছন্নভাব, সেই ঘোর ভাঙ্গল; ফ্যাশিষ্টদের ভারি বুটের শব্দ প্রথমে প্রতিধ্বনিত হ'ল মাদ্রিদের পথে, তারপর প্যারিসের পথে; কিন্তু এটা হ'ল পাব্‌লো নেরুদার নতুন যুগের পর্য্যায়ে।

(২)

১৯৩৬ সালে পাব্‌লো নেরুদা ইতিমধ্যেই একজন নামকরা কবি হয়ে উঠেছেন। ল্যাটিন-আমেরিকা ও স্পেনে তিনি হয়ে উঠেছেন প্রিয়। মাদ্রিদে চিলি সরকারের কন্‌সালের পদে তিনি ছিলেন অধিষ্ঠিত। সরকারী কাজের পরেও তাঁর যথেষ্ট অবসর ছিল কবিতা লেখার, তাঁর প্রিয়

মাদ্রিদের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে ঘুরে বেড়াবার, বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা
করার। এই বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন 'জিপ্‌সি রোমান্সেরো'র লেথক ফ্রেডারিকো
গার্সিয়া লর্কা, রাফায়েল অ্যালবার্ট, পল গঞ্জালেজ-তুনোন। তাঁরা প্রায়ই
পাব্‌লো নেরুদার বাড়িতে এসে জমায়েৎ হতেন, বসতেন বারান্দাতে
যেখান থেকে দেখা যেত মাদ্রিদের বাড়ির ছাতগুলি আর তারও
ওধারকার উঁচুনিচু পাহাড়গুলি, আর তাঁরা আলোচনা করতেন কবিতা নিয়ে।
তার পরে অনেকে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগল, 'অতল কাব্যের' উৎসাহী
প্রবক্তার হ'ল কী, তাঁর কবিতার ভিতর 'এরোপ্লেন' 'ফ্রাঙ্কো' 'রাইফেল'
'গেরিলা' 'কমিসার' 'জনগণ' এসব কথা এল কি করে? 'হ'ল কী'
এই কথার জবাব পাব্‌লো নেরুদা তাঁর 'কৈফিয়ৎ' নামক কবিতাতে দিয়েছেন:

তোমরা শুধাবে: কোথায় গেল তোমার লাইলাক ফুল?
কোথায় গেল তোমার আফিমের ফুল-ছড়ানো অধ্যাত্ম দর্শন?
কোথায় গেল তোমার সেই মাঝে-মাঝে বিরাম নিয়ে
কথা-ঝরানো বৃষ্টি?
কোথায় গেল তোমার পাখীর দল?
আজ ব'লবো তোমাদের কী হয়েছে আমার।

* * * *

একদিন আমার বাড়িকে লোকে ব'লতো "ফুলের বাড়ি,"
জেরানিয়াম ফুটে থাকৃত সবখানে,
শিশুর হাসিতে আর দুরন্ত কুকুরের দাপাদাপিতে
খুশির ঝড়ে কাঁপত আমার বাড়ি।

* * * *

এল গলাকাটার দল
এল তারা মরোক্কোর বর্ব্বর আর উড়োজাহাজ নিয়ে,
সাথে এল পুরোহিতের দল, আশীর্ব্বাদ করলে হত্যাকারীদের—
এল তারা শিশুহত্যার বীভৎস সংকল্প নিয়ে,
শিশুরক্তের বন্যায় ভেসে গেল পথঘাট,
যেমন, যেমন ভেসে যেতে পারে শিশুরক্তের বন্যায় পথঘাট।

ফ্যাশিষ্টরা গ্রানাদাতে ফ্রেডারিকো গার্সিয়া লকার্কে গুলি করে মারল।

প্রতি রাত্রে মাদ্রিদে শিশুদের হত্যা করা হতে লাগল এরোপ্লেন থেকে
ফ্রাঙ্কোর দস্যুদল আর দুটো ফ্যাশিষ্ট সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্পেনের জন-
গণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চলল। চিলির কন্‌সাল "হস্তক্ষেপ না করার" পক্ষে
ঘোষণা করতে পারতেন। "অতল কাব্যের" কবি "আফিমের ফুল-ছড়ানো
অধ্যাত্ম দর্শনের" কল্পনায় মসৃগুল থাকতে পারতেন। পাব্‌লো নেরুদা কিন্তু
করলেন অন্য রকম; তিনি স্পেনের জনগণের পক্ষে যোগ দিলেন।

পাব্‌লো নেরুদার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় মাদ্রিদে, বিধ্বস্ত মাদ্রিদে।
তাঁর চেহারা দেখে আমি চমকিত হয়েছিলাম—বিষন্ন এবং চিন্তামগ্ন
আন্দালুসিয়ান এবং গর্বিত আরাউকানিয়া চেহারা। তাঁর ভাব ভঙ্গি
ছিল সহজ ও স্বাভাবিক, কণ্ঠস্বর ছিল কোমল, এবং তাঁকে দেখলে মনে
হ'ত যে এ লোক তৈরী হয়েছে চিন্তা করার জন্যে—কবিতা লেখার
জন্য; কিন্তু তাঁর চোখ জ্বলে উঠতে কখনো ভালোবাসা এবং কোমলতায়,
কখনও বা ক্রোধে। তিনি বলতেন কেবল সংগ্রামের কথা: "কাসা দে
কাম্পো, লণ্ডন, বেইমানী, আন্তর্জাতিক ব্রিগেড, জনগণ, মস্কো, আশা…।"
এবং তার জন্যে যথাসাধ্য তিনি করেছিলেন বটে কারণ তিনি চেয়েছিলেন
স্পেনের জনগণের সঙ্গে থাকতে। শেষ পর্য্যন্ত চিলির গবর্ণমেণ্ট তাঁকে স্পেন
ছাড়তে হুকুম করল।

চিলিতে এসে তিনি একটা বই লিখিলেন—'আমার প্রাণের স্পেন'।
তা হল ক্রোধ এবং সশ্রদ্ধ প্রেমে পরিপূর্ণ কবিতা—দর্শকের লেখা কবিতা
নয়, সৈনিকের কবিতা।

এই বইটি বেরোলো চিলিতে এবং শীঘ্রই তার অনুবাদ ছাপা হ'ল,
ইওরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন ভাষায়। স্পেনেও বইখানি প্রকাশিত হ'ল
স্বাধীন স্পেনের মাটির শেষ জায়গাটিতে। মাদ্রিদ-রক্ষার দ্বিতীয় বার্ষিকীর
দিন ১৯৩৮ সালের ৭ই নভেম্বর বইটি বেরোলো। এবং মুখবন্ধে ছিল এই
কথা ক'টি:

"প্রসিদ্ধ কবি পাব্‌লো নেরুদা (গার্সিয়া লর্কা বলছেন যে রুবেন
দারিওর মৃত্যুর পর ইনিই হলেন আমেরিকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি)
যুদ্ধের প্রথম কয়েকমাস আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি এই বইটি
লিখেছেন সাগরপারে বসে; সেখানে তিনি যেন গিয়েছেন নির্ব্বাসনে।
ইষ্টার্ন আর্মির সামরিক কমিসারিয়েট এখন বইটি স্পেনে প্রকাশ করছেন।

গণতন্ত্রের সৈনিকেরাই এই বইয়ের কাগজ তৈরী করেছেন, এর ছাপ অক্ষরগুলি সাজিয়েছেন এবং বইটি ছেপেছেন। আমাদের বন্ধু এই ক লাইন উৎসর্গ-পত্র বলে গ্রহণ করুন।”

অনেক হাতড়ে, অনেক খুঁজে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করে তবে এ ধরণের প্রাঞ্জলতা আয়ত্ত করা যায়। সে-প্রাঞ্জলতা হ'য় পরিণত শিল্প প্রাঞ্জলতা। আমার মনে হয়, পাব্‌লো নেরুদা ষ্টালিনগ্রাদে লেখা কবিত গুলিতে এবং তাঁর 'রেলপথ-ভাঙ্গা মানুষেরা জাগুক' কবিত সে প্রাঞ্জলতা অর্জ্জন করেছেন। তাঁর কবিতাগুলিতে এখনও অনে জটিলতা, আছে যা বোঝা কিছুটা শক্ত। তা সত্ত্বেও তাঁর 'আমার প্রাণে স্পেন' সংগ্রামী স্পেনের প্রাণ স্পর্শ করেছিল। এবার পাব্‌লো নেরুদ এই কাজ কেবল আর কাব্যের সমজদারদের অনুপ্রাণিত করল না- অনুপ্রাণিত করল সাধারণ পাঠকের সমাজকেও।

স্পেনের ট্রাজেডি, তার দারিদ্র্য তার ঐশ্বর্য্য সম্পর্কে পাব্‌লো নেরু খুব জোরের সঙ্গে, প্রেমের সঙ্গে বলছেন :

শুকিয়ে পুড়ে কাঠ হয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্পেন ;
দিনের দুন্দুভি বেজে চল্‌ল একটানা একঘেয়ে সুরে।
নীচের সমতল ভূমিতে ঈগলের বাসায়
নীরবতা জেগে রইল ঝড়ের চাবুকে জর্জরিত হ'য়ে।
কী যে ভালোবাসি তোমাকে, হে কঠিন মাটি,
ভালোবাসি তোমাকে চোখের জল দিয়ে ;
ভালোবাসি তোমার সামান্য শস্যকণা
ভালোবাসি তোমার দৈন্যজর্জর নরনারীকে।

* * * *

মাটির বুকে দুঃসহ যন্ত্রণা
চারিদিকে অসীম নীরবতা
মৌমাছির মতো অনলস পরিশ্রম, কঠিন পাথুরে মাটি।
মাটির বুকে শস্য নেই, সবজী নেই,
আছে রক্তের দাগ।

ফ্যাশিষ্টদের প্রতি ঘৃণায় ভরা এই কথাগুলি পড়বার সময় 'না শাটিমেন্টস'- এর হ্যুগোর কথা মনে পড়ে না—হ্যুগো যেন কিছুটা অলঙ্কার-ভারগ্র

—মনে পড়ে আগ্রিপা দ' অবিগ্‌নের কথা, এবং মাঝে মাঝে বাইবেলের পয়গম্বরদের কথা।

এই সব শেয়ালকে শেয়ালরাই দূরে রেখে চল্‌বে,
এই সব সাপকে সাপেরাই ঘেন্না করবে,

অরক্ষিত আলমেরিয়া শহরের উপর জর্মান জাহাজের শেল বর্ষণের কথা বলতে গিয়ে পাব্‌লো নেরুদা হত্যাকারীদের ওপর তাঁর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। মনশ্চক্ষে তিনি দেখছেন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর স্থান হয়েছে নরকে :

সবার অভিশাপ মাথায় নিয়ে একা জেগে রইবে তুমি,
একা পাহারা দিতে হবে তোমাকে মৃতদের,
ঘুমের ছোঁয়া পাবে না কোনদিন চোখে।
মাথার উপর তোমার টুপ টুপ করে রক্ত ঝরবে বৃষ্টির মতো,
আর উপড়ে-নেয়া চোখের একটা নদী
অনিমেষ চেয়ে রইবে তোমার দিকে—
তীব্র, দুঃসহ যন্ত্রণার জোয়ারে
বয়ে যাবে চিরদিন।

স্পেনের জনগণের বীরত্বের কথা কবি অনুপ্রেরণার সঙ্গে লিখে গিয়েছেন— যারা ইট তৈরী করে সেই সব মজুর, খনি-মজুর, কৃষক ও ছুতোর মিস্ত্রি স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে কিভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল তারই কথা বলেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের সংগ্রামী সৈনিকেরা যে সৌভ্রাত্র জগতকে দিয়ে গেছেন, তারই মহান দৃষ্টান্তের কথা তিনি লিখেছেন।

বন্ধুদের কাছ থেকে বহু দূরে থেকে, যা তাঁর জীবনের একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছে তার কাছ থেকে বহু দূরে থেকে তিনি ভাবছেন মাদ্রিদের কথা :

এই শহর—
আমি যা কিছু ভালোবাসি সব কিছুই
বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা এই শহর।
এই শহরে আজ রুটি নেই, আলো নেই ;
শুকিয়ে-আসা জেরানিয়াম ফুলের উপর নেমে আসছে
স্ফটিকের মতো নিটোল, কঠিন শীতলতা।

* * * *

এই শোকের শহর আজ আহত,
বুলেটে-বুলেটে জর্জ্জরিত, বোমার টুক্‌রোয় ক্ষতবিক্ষত,
ভগ্ন, পঙ্গু, রক্তাক্ত, অপমানিত—
রাত্রির সান্ত্বনা নেই এর।
মধ্যরাত্রির এই শব্দহীন শহরে
জাগে শুধু কামান আর বীরের দল।

বইটির একটি কপি পাব্‌লো নেরুদা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। বইয়ের মলাটের পরের সাদা পাতাটিতে তিনি লিখেছিলেন : "এ হ'ল দুঃখ এবং আশার বই।"

গণতন্ত্রীদের শেষ দলকে যখন তাদের জন্মভূমি ছাড়তে হ'ল, তখন তাদের মধ্যে যাদের দালাদিয়েরের বন্দীনিবাসে পোরা হয়েছিল, স্পেনের সেই সব কমরেডকে বাঁচাবার জন্যে পাব্‌লো নেরুদা তাঁর সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন; তিনি এজন্যে প্যারিসে আসেন এবং কয়েক হাজার স্পেনবাসীর ফ্রান্স ছেড়ে চলে যাবার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন।

স্পেন ছিল তাঁর মর্ম্মের সঙ্গে মিশে। তিন বছর পরে ষ্টালিনগ্রাদ সম্পর্কে লেখা তাঁর চমৎকার কবিতায় তিনি মাদ্রিদের রাত্রির কথা স্মরণ করে লিখেছেন :

সেদিনও এমনই একা দাঁড়িয়েছিল স্পেন,
আজ যেমন তুমি একা দাঁড়িয়ে আছ, ষ্টালিনগ্রাদ।
সেদিনও যখন যন্ত্রণায় আঙ্গুল দিয়ে মাটি ছিঁড়ছিল স্পেন,
প্যারিস হাস্‌ছিল আনন্দে, উৎসবে।
সেদিনও যখন স্পেনের দেহ থেকে প্রাণরক্ত ঝরে যাচ্ছিল বন্যার মতো,
লণ্ডন ছাঁটছিল তার বাগানের ঘাস
আর পালছিল রাজহাঁস।

(৩)

পাব্‌লো নেরুদার জীবনে তিনটি শহর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাদের মধ্যে দুটির কথা আমি ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। একটি হ'ল টেমুকো, যেখানে তিনি জন্মেছিলেন; আর দ্বিতীয়টি হ'ল মাদ্রিদ, যেখানে তিনি মৃত্যুর মধ্যে জীবনকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তৃতীয় শহরটি হ'ল ষ্টালিনগ্রাদ, যার

উদ্দেশে পাব্‌লো নেরুদা তাঁর সবচেয়ে চমৎকার কয়েকটি কবিতা উৎসর্গ করেছেন। ষ্টালিনগ্রাদের রক্ষীদের মহান বীরত্ব চিলির কবির জীবন এবং কাব্যকে অবিরাম অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

যুদ্ধ শুরু হবার আগের শীতকালটাতে পাব্‌লো নেরুদার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়—তখনো ফরাসীরা বুঝতে পারেনি তাদের ঘৃণিত শাসন-কর্ত্তারা ঠাট্টাতামাশার মধ্যে দিয়ে দেশটাকে কোথায় ঠেলে নিয়ে চলেছিল কমিউনিষ্টদের জেলে পোরা হ'ল; খবরের কাগজগুলো দিন রাত ধরে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে লাগল। এই সময়ে পাব্‌লো নেরুদা হ'লেন কমিউনিষ্ট, ঘোষণা করলেন যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ইওরোপকে ফ্যাসিবাদের হাত থেকে বাঁচাবে। ১৯৩৬ সালে অনেক বামপন্থী বুদ্ধিজীবী এই ভাবে তর্ক করতেন এবং ১৯৪৩ সালে প্রায় প্রত্যেকেই এই রকম ভাবতেন। কিন্তু পাব্‌লো নেরুদা একথা বললেন ১৯৩৯ সালের বসন্তকালে, যখন কমিউনিজম ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করতে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দিতেন।

১৯৪২ সালে পাব্‌লো নেরুদা ছিলেন মেক্সিকো শহরে চিলির কন্‌সাল। একদিন সকালে শহরের লোক উঠে দেখল দেয়ালে দেয়ালে অদ্ভুত ধরনের প্ল্যাকার্ড মারা রয়েছে। চুক্তিপত্রের ধারা অগ্রাহ্য করে পাব্‌লো নেরুদা ষ্টালিনগ্রাদের উদ্দেশে উৎসর্গ-করা তাঁর কবিতা দেয়ালে সেঁটে দিয়েছেন। সোভিয়েট রুশিয়ার যে-সব মিত্রেরা দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলতে ইচ্ছা করেই দেরী করছিল, সোভিয়েট নগরীর উদ্দেশে লেখা এই চমৎকার কবিতাটির জায়গায় জায়গায় তাদের বিরুদ্ধে সুতীব্র অভিশাপই যেন ধ্বনিত হচ্ছিল :

হাজার হাজার বুলেটে যখন তোমার বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে,
যখন বিষাক্ত কাঁকড়া বিছের ঝাঁক হুল বাগিয়ে
ধেয়ে আসছে তোমার দিকে,
তখন, হে ষ্টালিনগ্রাদ,
নিউইয়র্ক নাচ্‌ছে আর লণ্ডন ভাব্‌ছে।
কিন্তু আমি বল্‌ছি, ওরা শয়তান।
কারণ, আর সহ্য কর্‌তে পারি না আমি,
আমরা আর সহ্য করতে পারি না সেই দুনিয়াকে
যেখানে বীরের একাকী মরে যায়।

* * * *

তোমাদের বীরত্বের কীর্ত্তিকাহিনী শুনতে শুনতে
তুনিয়ার কান পচে যেতে বসেছে আজ,
মাদাগাস্কারে তোমাদের বীর সেনাপতিরা
কেমন করে পঞ্চান্নটি বানরকে হত্যা করেছিলো
সেই সব গৌরবকাহিনী।
আর তোমাদের শরতকালীন সম্মেলনের বিবরণ,
যেখানে সভাপতিত্ব করে থাকেন মহিলাদের একটি ছাতা।

কবিতাটি আরম্ভ হয়েছে এক অত্যন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ চিত্র দিয়ে—সমগ্র জগতের চোখ তখন একটি মাত্র শহরের দিকে নিবদ্ধ :

রাতের বেলায় ঘুমন্ত মজুর হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠে,
হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দেয় অন্ধকারের বুকে, সকালকে জিগ্যেস করে :
বল হে সকাল, হে সকালের সূর্যা, হে প্রথম দিনের আলো, বল,
মেহনতী মানুষের পবিত্র হাত কী এখনো তাদের ইজ্জতের কেল্লা
রক্ষা করছে? জবাব দাও, হে সকাল, জবাব দাও।
এখনো কি ইস্পাত আগের মতোই তোমার মুখের পরে তার শক্তির
হল্‌কা ছুড়ে মারছে? এখনো, এখনো কী তারা হুঁশিয়ার আছে?
এখনো কি বাজ গর্জাচ্ছে? কেঁপে-কেঁপে ওঠা পৃথিবী·
এখনো কী শুনছে খুনে-ভেজা মাটিতে টপ্ টপ্ করে বীরের
রক্ত ঝরার শব্দ? রাত্রি যখন উজ্জ্বল মহিমায় পৃথিবীর উপর
ঝলমল করে, তখনো কী আকাশ গাছের মাথাকে
ঢেকে দাঁড়ায়? ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষার জন্যে যথেষ্ট বারুদ মজুত
আছে তো? ঘুমন্ত মজুর জেগে উঠে সকালকে এই কথা জিগ্যেস করে।
আর তুরন্ত সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে নাবিক
ভেজা অস্পষ্ট তারাগুলোর দিকে তাকায় আর খোঁজে একটি তারাকে
একটি তারা সেই মহান, গর্বিত, জলন্ত শহরের লাল তারা।
তারাটিরে দেখতে পায় সে, সেই জলজলে লাল তারাটিরে.
নিজের বুকের মধ্যে সে তারাটিরে ছোঁওয়ার জন্যে তার
দশটি আঙুল পাগল হয়ে ওঠে। তারাটি কিন্তু তার নিজের
তু'চোখে, চোখের জলে ভিজে জল জল করে।

কবি যেখানে ল্যাটিন-আমেরিকার প্রাণের আবেগের কথা বলছেন সেখানকার আরও কয়েকটি লাইন আমি তুলে দিচ্ছি :

ষ্টালিনগ্রাদ, তোমার দেয়াল ছুঁতে পারিনা আমরা,
ছুঁতে পারিনা তোমাকে, আমরা যে অনেক দূরে।
আমরা মেক্সিকোর লোক, আরাউকানিয়া,
পাটাগোনিয়ার লোক আমরা, আমরা গাউরানি,
চিলি, উরুগুয়ার লোক—কোটি কোটি লোক আমরা।
হে জ্বলন্ত সহর তোমাকে রক্ষার জন্য আমরা আসতে পারছিনা।
তাই, ততদিন, ততদিন যুঝ্‌তে থাকো তুমি,
যতদিন না আমরা, ঝড়ে-বিধ্বস্ত ইণ্ডিয়ানরা
তোমার দেয়ালকে স্পর্শ করতে না পারি
সেই সব মানুষের চুম্বন দিয়ে
যারা আশা করেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন এখানে আসবার।

পাব্‌লো নেরুদা জানতেন যে ইওরোপ এবং আমেরিকার ভবিষ্যৎ, মানব-সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল ষ্টালিনগ্রাদের ওপর, সুদূর রুশিয়ার যুদ্ধের ওপর। তিনি কেবল কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হ'লেন না; তিনি হ'লেন বক্তা, পুস্তিকা-রচয়িতা—তিনি হয়ে উঠলেন এমন একটি মানুষ যাঁর কথা আমেরিকার সমস্ত জনসাধারণ মনোযোগ দিয়ে শুনল। শত্রুদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ· তিনি খুলে দিলেন। তিনি দাবী করলেন সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাহায্য করার। জনসাধারণের জীবনের ভাগ নেবার জন্যে তিনি সংস্কৃতিবান লোকদের কাছে আহ্বান জানালেন। আমার যুদ্ধের সময়কার লেখার এক সঙ্কলনের মুখবন্ধে "নিরপেক্ষ" বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়ে তিনি বলেন : "আজটেক, আর্জেন্টিনা বা কিউবার তরুণকে কাফকা, রিল্‌ক্ অথবা লরেন্সকে নিয়ে কেঁদে মরতে দেখলে আমি ক্রোধে অভিভূত হয়ে পড়ি।... "বিশুদ্ধ কাব্যের" ভাবনায় অসময়ে বুড়িয়ে-যাওয়া এই সব অনভিজ্ঞ তরুণ—এরা প্রাথমিক মানবিক কর্ত্তব্যটুকু পর্য্যন্ত ভুলে গেছে। আজ যে সংগ্রাম না করে সে কাপুরুষ। অতীতের যে-সব জের কোনমতে টিকে আছে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা অথবা স্বপ্নের গোলক-ধাঁধার মধ্যে পথ খুঁজে বেড়ানো আমাদের যুগের যোগ্য কাজ নয়। মানুষের জীবন এবং সংগ্রাম

এমন ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে যে কেবল আমাদের যুগেই, আমাদের সংগ্রামের ভিতরেই শিল্পের উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে। সোভিয়েটের বিস্ময়কর মহান প্রতিরোধ কিছু একটা অলৌকিক ঘটনা নয়, এটা গভীরভাবে বাস্তব ব্যাপার এবং যথার্থই মানুষেরই কীর্ত্তি''।

বলশেভিকদের কথা উল্লেখ করে পাব্‌লো নেরুদা তাঁর লেখা এই মুখবন্ধে ঘোষণা করলেন যে "মহান কমিউনিষ্ট পার্টিই মানুষের একমাত্র পার্টি।"

ষ্টালিনগ্রাদের উপরে লেখা তাঁর দ্বিতীয় বড় কবিতায়ও পাব্‌লো নেরুদা আবার 'সোভিয়েটের মহান বিস্ময়কর প্রতিরোধে'র কথা নিয়েই লিখেছেন। এখানে এই প্রতিভাশালী কবির মতাদর্শ ভল্‌গার তীরে অবস্থিত নগরের উদ্দেশে রচিত গানের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এ হ'ল ভবিষ্যতের প্রতি, মানুষের প্রতি আনুগত্যের শপথ। 'ষ্টালিনগ্রাদের প্রতি ভালোবাসার নতুন গানে' কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রচনারীতি ছেড়ে দিয়েছেন; তাঁর কবিতা এখন ক্লাসিকাল রচনারীতির ঢের কাছে গিয়ে পড়েছে, তাঁর রচনায় এখন মিল এবং স্বরসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। কবিতাটির আরম্ভ হ'ল:

সময়ের কথা, সাগরের কথা লিখেছি অতীত দিনে
আকাশের কথা, শোকের বারতা লিখিতাম দিনরাত,
লিখেছি তখন আপেলগাছের বাতাসে দোলার কথা,
আজ শুধু গাই তোমার কথাই, হে মোর ষ্টালিনগ্রাদ।
একদা তরুণী সোহাগে খুশীতে প্রেমের শিখাটি মোর
রেখেছিল ঢেকে আঁচল আড়ালে পরম যতন সাথ,—
আজ সে হৃদয় দূরে বহুদূরে লড়াই-ঝড়ের মাঝে
যেথায় ধোঁয়ায়, বিজলী ঝলকে জাগিছে ষ্টালিনগ্রাদ।
একদা ছুঁয়েছি অস্তরবির শোকের বসনখানি
হেরে মরে-যাওয়া সূর্য্যের চোখে পেয়েছি ব্যাথার স্বাদ,
তোমার সূর্য্য-ওঠার আলোকে, হে মোর ষ্টালিন গ্রাদ···

কবিতাটির শেষে কটি লাইন হল:

জয় হোক তোমার ষ্টালিনগ্রাদ, তোমার জন্ত বাতাস আজ বিনা বাধায় বইতে পারছে,

যতগান বাঁধা হয়েছে তোমাকে নিয়ে, তার সাথে আমাদের গানও জুড়েছি আমরা,
এই সব গানের জন্ত জয় হোক তোমার ষ্টালিনগ্রাদ!
জয় হোক তোমার মায়েদের, জয় হোক তোমার শিশুদের
জয় হোক এই শিশুদের সন্তানদেরও, জয় হোক তোমার ষ্টালিনগ্রাদ।
কুয়াসার-অন্ধকারে লড়াই করে যে বীর তার জয় হোক,
জয় হোক কমিশারের আর সৈন্ত-স্কোয়াডের।
জয় হোক সেই আকাশের যে আকাশ জোৎস্নায় মহিমায় ঢেকে রাখে তোমাকে,
জয় হোক সেই সূর্য্যের যে সূর্য্য জ্বলে তোমার মাথার উপর, ষ্টালিনগ্রাদ।

আমার কবর যেন পাহারা দেয়
সাগরতটে গর্জে ভেঙ্গে-পড়া ক্রুদ্ধ জলোচ্ছ্বাস,
একটা বন্দুক, একখানা লাঙল আর
তোমার দেশের শষ্যের ফলন্ত লাল শীষ।
তোমার ভালোবাসায় ডুব দিয়ে বেঁচে ছিলাম আমি,
বুক ছিল আমার তোমার দেশের ভালোবাসায় ঘেরা,
এ কথায় যেন কেউ সন্দেহ না করে
যদিও শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলে যেথায় তার থেকে বহু দূরে
তোমার প্রতি আমার এই ভালবাসার গান রচনা করেছি আমি, ষ্টালিনগ্রাদ,
রচনা করেছি, রেখে যাচ্ছি এই বন্দনা
একটা কালো রংএর বোমার মত।

পাব্‌লো নেরুদা এবং 'বিশুদ্ধ কাব্যের' প্রবক্তাদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে লাগল। 'সুইগ এবং পেট্রভ' নামে তাঁর একটি লেখা নিয়ে আমি আলোচনা করব। ব্রেজিলে ষ্টেফান জ্বুইগের আত্মহত্যা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পেট্রভের মৃত্যুর-কথা পাব্‌লো নেরুদা একই সময়ে জানতে পারেন। তিনি লেখেন: "জ্বুইগের মৃত্যু হ'ল স্বাভাবিক মৃত্যু, আর বাঁচবার মতো কোন কিছু যার অবশিষ্ট নেই তেমন এক যুগের

মৃত্যু। তাঁর মৃত্যু হ'ল এমন একটি মানুষের মৃত্যু যিনি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম ক্রিয়াকর্ম্মের সময়েও করবার মতো কাজ কিছু খুঁজে পাননি; এ হ'ল এমন একজন লেখকের মৃত্যু যিনি সব বলেছেন কিন্তু আরও কিছু বলবেন বলে আশা করা গিয়েছিল। পেট্রভ মরেছেন লড়তে লড়তে, কাজ করতে করতে। সেইটিই হ'ল তাঁর মহত্ত্ব।" নেরুদা এই ভাবেই লেখকের কর্ত্তব্য বুঝেছিলেন এবং তাঁর এই মহৎ বাক্য তিনি শীঘ্রই মহৎ কার্য্যের ভিতর রূপায়িত করে তুললেন।

৪

পাব্‌লো নেরুদার জীবনে বিক্ষোভের ঝ'ড়ো দিন দেখা দিল। চিলিতে ফিরে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিতে লাগলেন, লিখতে লাগলেন কবিতা ও প্রবন্ধ। কৃষক, খনিশ্রমিক ও নাবিকদের সঙ্গে পরিচয় করতে করতে তিনি সারা দেশে ঘুরে বেড়ালেন। শ্রমিকরা তাঁকে তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে আইন সভায় পাঠালেন। তার পর এল প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের পালা। কমিউনিষ্টরা প্রেসিডেণ্ট-পদপ্রার্থী গঞ্জালেস ভিডেলাকে সমর্থন করেছিলেন; তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, গণতন্ত্রের পতাকা তিনি উড্ডীন রাখবেন, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করবেন আর কৃষি-সংস্কার সাধন করবেন।

নির্ব্বাচনী অভিযানের একজন নেতা ছিলেন সেনেটর পাব্‌লো নেরুদা। গঞ্জালেস ভিডেলা প্রসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হ'লেন এবং তিনজন কমিউনিষ্ট মন্ত্রী হলেন। সারা দেশে ঘুরে ঘুরে পাব্‌লো নেরুদা তাঁর কাজ করতে লাগলেন। দেশের দূর দূর অঞ্চলে গিয়ে গিয়ে তিনি খনিশ্রমিকদের জীবন অনুধাবন করলেন, নতুন আইনের খসড়া প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করলেন।

যুদ্ধের ভিতর পাব্‌লো নেরুদা 'বিশ্বজনীন সঙ্গীত'নামে একটা বড় বই লেখবার কথা ভেবেছিলেন। কবিতায় লেখা এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসটির কিছুটা অংশ 'মাচ্চু পিচ্চু পর্ব্বতের শিখরে' নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। পাব্‌লো নেরুদা এটা লেখেন ১৯৪৬ সালে। পর্ব্বতের পাদদেশে শুয়ে কবি দেখতে পান তাদের দেহাবশেষ যারা খেটে খেটে মরেছে, দেখতে পান "মাটির নীচে চাপা-পড়া আমেরিকাকে", দেখতে পান গরীব হতভাগ্যদের হাড়, দেখতে পান "পাথর-ভাঙ্গা জুয়ান" "উপবাসী জুয়ান" "খালি-পা

জুয়ানের" দেহাবশেষ। তিনি তাদের সঙ্গে কথা কন, তাদের ডাকেন। কিন্তু সিনেটের কাজের চাপে পড়ে নেরুদা কবিতায় লেখা এই উপন্যাস শেষ করতে পারেননি। ১৯৪৭ সালে চিলির কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব স্থির করেন যে, জনসাধারণের স্বার্থে কবির পক্ষে লেখাই বেশী দরকারী এবং তিনি যাতে লিখতে পারেন তার জন্যে এক বছর নেরুদাকে তাঁরা দৈনন্দিন রাজনৈতিক কাজ থেকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেন। পাব্‌লো নেরুদা "বিশ্বজনীন সঙ্গীত" লেখার কাজ শুরু করেন। কিন্তু তারপর···

গঞ্জালেস ভিডেলা কেমন সুপরিকল্পিত ভাবে চটপট হামলা করে ক্ষমতা দখল করল তা নিয়ে আমি আলোচনা করব না। এটা অনেকটা ফ্রান্স ও ইতালির অনুরূপ ঘটনাবলীরই মতন। চিলির এই ডিক্টেটরের বিভিন্ন ঘোষণার মধ্যে আমরা যা দেখতে পাই তা হ'ল মার্কিন পররাষ্ট্র দফ্‌তরেরই অতি পরিচিত ছাপ। ১৯৪৭ সালের শরৎকালে পাব্‌লো নেরুদা আবার কবিতা লেখা ছাড়তে বাধ্য হয়ে বললেন:

"গঞ্জালেস ভিডেলার বিভিন্ন কমিউনিষ্ট-বিরোধী ঘোষণা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুমেই করা হয়েছে। আপনারা জিজ্ঞাসা করছেন বিপদটা কোথায়? আজকে বিপদটা রয়েছে একটি মাত্র জিনিসের মধ্যে। মানুষকে দাসে পরিণত করা এবং তার প্রগতির গতি রুদ্ধ করার চেষ্টার মধ্যে। জার্ম্মানীতে লড়াইয়ের ময়দানে নাৎসীরা পরাস্ত হয়েছে; কিন্তু নাৎসীরা আশ্রয় পেয়েছে ওয়াল ষ্ট্রীটের ইয়াঙ্কিদের পক্ষপুটে—জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের এই নতুন দাবীদারদের পক্ষপুটে।"

চিলিতে ঘটনা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। বেইমান গঞ্জালেস ভিডেলা শ্রমিক-সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল, কথা বলার স্বাধীনতা বিলোপ করল, কমিউনিষ্ট পার্টির উপর অত্যাচার চালাল, এমন ভাবে সোভিয়েটের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল যাকে উস্কানি দেওয়া ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। পাব্‌লো নেরুদার মর্য্যাদা শুধু দেশের ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল না, সারা পৃথিবীই তাঁকে মর্য্যাদা দিত। একটা খোলা চিঠিতে তিনি এই "অতর্কিত বলপ্রয়োগে ক্ষমতা দখলের" প্রকৃত কাহিনী বর্ণনা করলেন। পাব্‌লো নেরুদা জানতেন যে, প্রেসিডেণ্টের বেইমানীর মুখোশ তিনি এই ভাবে খুলে দেওয়ার পর সে আর নির্ব্বিকার হয়ে থাকবে না; তাই কবি তাঁর চিঠি শেষ করলেন প্রেসিডেণ্টকে

এই ব'লে হুঁশিয়ার করে দিয়ে : যদি তিনি খুন হ'ন, তবে চিলির গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ করে গঞ্জালেস ভিডেলাকে কলঙ্কিত করবে তাঁর রক্ত।

এর পরেই ভিডেলার চররা পাব্‌লো নেরুদার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিল। এই বাড়ীতে ছিল তাঁর মূল্যবান গ্রন্থাগার ও শিল্প-সংগ্রহ। নেহাত ঘটনাচক্রে বাড়ীটা একেবারে ভস্মসাৎ হয়ে যায়নি। যাই হোক, গবর্ণমেণ্ট পাব্‌লো নেরুদার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনল, তাঁর বিচার শুরু করল।

চিলির সিনেটররা ১৯৪৮ সালের ৬ই জানুয়ারীর কথা ভুলতে পারবে না। তাদের নয়া ডিক্টেটরের প্রতি তাঁবেদারী ঘোষণা করবার জন্যে তারা এই দিন স্থির করেছিল। পাব্‌লো নেরুদা বক্তৃতামঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেনেটররা জানত যে, এ লোকটা কবি এবং কাজে-কাজেই একটু ছিটগ্রস্ত ; তারা জানত কমিউনিষ্টের কাছ থেকে বৈঠকী আলাপ আশা করা যায় না। কিন্তু এর পর যা হ'ল তাতে তারা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত লোকটি আত্মপক্ষ সমর্থন করা পর্য্যন্ত দরকার মনে করল না ; সে বরং তথ্য-প্রমাণ সমেত ক্রুদ্ধ ভাষায় দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনল রাষ্ট্রের সভাপতি গঞ্জালেস ভিডেলার বিরুদ্ধেই।

সেদিন পাব্‌লো নেরুদার ধীর কোমল কণ্ঠে একটা কঠিনতা দেখা দিয়েছিল। এই ডিক্টেটরের প্রতিটি অপরাধের মুখোশ খুলে দিয়ে তিনি প্রতিবারেই বললেন—"আমি সেনর গঞ্জালেস ভিডেলাকে অভিযুক্ত করছি ···।" কি কি অপরাধে কবি প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন ? ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে গঞ্জালেস ভিডেলা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, ধর্ম্মঘটীদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে গঞ্জালেস ভিডেলা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ওয়াশিংটনের দাবীতে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করে গঞ্জালেস ভিডেলা রিপাবলিকের স্বাধীনতা পদদলিত করেছে, বিদেশীর হাতে দেশের রক্ষাব্যবস্থা তুলে দিয়ে গঞ্জালেস ভিডেলা দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

কেবল প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেই পাব্‌লো নেরুদা ক্ষান্ত হননি। সেনেটের বক্তৃতামঞ্চ থেকে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির গৌরব কীর্ত্তন করে বলেছিলেন : "আমি অভিনন্দন জানাই 'চিলির সমস্ত কমিউনিষ্টদের নির্য্যাতিত দলিত নরনারীদের। তাদের অভিনন্দন জানিয়ে আমি বলি :

আমাদের পার্টি অমর। জনগণের দুঃখ কষ্টের জবাব হিসাবেই পার্টির জন্ম. এবং পার্টির বিরুদ্ধে এই অভিযান পার্টিকে আরও বড় করে তুলছে, আরও শক্তিশালী করে তুলছে···"।

কবি হয়ে উঠলেন তাঁর জনগণের মুখপাত্র, তাদের নেতা।

সেনেটে পাব্‌লো নেরুদার বক্তৃতার পর ঝড়ের মতো তোলপাড়-করা যে-সব ঘটনা ঘটেছিল সে-সম্পর্কে আমরা অতি অল্পই জানি। সারা ল্যাটিন-আমেরিকার গৌরব এই কবিকে আশ্রয় দেবার জন্যে মেক্সিকোর প্রতিনিধিরা তৈরী ছিলেন। কিন্তু ইয়াঙ্কিদের কথা কেবল তো স্যাণ্টিয়াগোতেই আইন নয়।··· দলকে দল চিলির পুলিস ডাকা হ'ল। আর্জেণ্টাইনের রক্তলোলুপ কুকুরের দল, আর মেক্সিকোর সীমান্তরক্ষীদের সাবধান করে দেওয়া হ'ল। এই বিদ্রোহী কবিকে যে-কোনো উপায়ে খুঁজে বার করবার জন্যে ইয়াঙ্কিরা উঠে পড়ে লাগল ; তাদের ভয় ছিল যে, কবির কণ্ঠ বুঝি আবার মুখর হ'য়ে উঠবে।

আর কবির কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠলও বটে। এ সম্পর্কে লুই আরাগঁ তাঁর "পাব্‌লো নেরুদার গান" নামক কবিতায় বলেছেন :

সবাই বুঝি এমন একই ভাষায় আমরা কথা বলি,
এগিয়ে চলি আমরা একই গান গেয়ে,
খাঁচা সব দেশেই খাঁচা,
কি চিলিতে, কি ফ্রান্সে।
কিন্তু, ও দেশটা টলমল করছে আজ
এক ভীষণ বিপর্য্যয়ের প্রচণ্ড ধাক্কায়,
এসেছে ওখানে গঞ্জালেস ভিডেলা'র
শয়তানী শাসনের ঘৃণিত দুর্দ্দিন।

* * * *

শহরে বন্দরে মাঠে ঘাটে পাহাড়ে সমুদ্রে
গন্ধ শোঁকা কুকুরের দল খুঁজে বেড়াচ্ছে,
কোথায় নেরুদা—কে জানে ?
কবি কিন্তু গান গেয়ে চলেছেন আগের মতই।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাব্‌লো নেরুদা "১৯৪৮ সালের কাহিনী"

নামে একটা কবিতা লেখেন। এই কবিতায় নির্য্যাতিত কবি বলেন যে, তিনি আছেন "আমেরিকায় কোনো এক জায়গায়।" চিলি, প্যারাগুয়ে এবং কষ্টা রিকার দুরূহ পরীক্ষার উদ্দেশে, বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ট্রুম্যানের আক্রমণের উদ্দেশে এই কবিতা তিনি উৎসর্গ করেন। "একটা নোংরা বৎসর, অন্ধ ইঁদুরদের বৎসর, ঈর্ষা এবং ক্রোধের বৎসরের" কবি বর্ণনা করেন।

সেনেটে পাব্লো নেরুদার বক্তৃতার এক মাস পর এই কবিতাটি লেখা হয়, এবং লেখার সময় তিনি যেন বেইমান গঞ্জালেস ভিডেলাকে তাঁর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন।

কবিতাটি শেষ হয়েছে অবিনাশী আশার বাণী দিয়ে: "আমার জনগণ জয়লাভ করবে, জয়লাভ করবে সমস্ত জনগণ।"

আমার মনে হয় লেখকের (পাব্লো নেরুদা—অ) কাছে "১৯৪৮ সালের কাহিনী" বলতে গেলে "রেলপথ-ভাঙ্গা মানুষেরা জাগো" নামে তাঁর বড় কবিতার প্রস্তুতিরই শামিল। শেষোক্ত কবিতাটিতে তিনি এই যুগের নাটক, তার দুঃখ, তার আশা পুরোপুরি ভাবে এঁকে গেছেন। যখন কোন চিলিবাসী বা আর্জেন্টিনাবাসী আমেরিকার কথা বলে, তখন সে সব সময়েই সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বলে দেয় কোন আমেরিকার কথা তার মনে আছে—লাটিন-আমেরিকার, না, উত্তর আমেরিকার। "রেলপথ-ভাঙ্গা" কবিতাতেও দুটি আমেরিকাই আছে। তা ছাড়া এই কবিতাটিতে আছে সামাজিক অর্থে দুটি আমেরিকা — সাম্রাজ্যবাদীদের আমেরিকা, আর জনগণের আমেরিকা। আধুনিক কাব্যে এত ব্যাপ্তিময়, বেগবান এবং করুণ কবিতা আর আছে বলে আমার জানা নেই।

"রেলপথ-ভাঙ্গা মানুষেরা জাগো" বেশ একটা বড় কবিতা—প্রায় সাতশ লাইনের কবিতা। অমিত্রাক্ষরে লেখা এই কবিতাটির ভেতর মিল নেই বটে, কিন্তু আছে একটা আভ্যন্তরীণ ছন্দ। কবি প্রায়ই পুনরুক্তি অথবা বিষয়বস্তুর ভারসাম্যের ওপর তাঁর কবিতা গড়ে তুলেছেন। এর ভেতর আছে প্রচারপুস্তিকা-লেখকের সুতীব্র বিদ্রূপ, আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধ কোমল গীতিলালিত্য। এই কবিতাটিতে পাব্লো নেরুদা তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন, এবং একথা বলতেই হবে যে রেলপথ-ভাঙ্গার পদ্যছন্দ (আমি এখানে

কেবল পদ্যছন্দের কথাই বলছি) মাঝে মাঝে "ঘাসের গুচ্ছ"-এর সেরা জায়গাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়।

মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের শয়তানি সম্পর্কে কবি বলছেন:

…তারা…তুলে দিচ্ছে তোমার হাতে এক পেয়ালা রক্ত:
(খুন করা হয়েছে একজনকে, একাই একশ): মার্শালী ককটেল।
বেছে নাও নওজোয়ানের খুন: চীনের চাষীদের খুন,
স্পেনের বন্দীদের খুন,
কিউবার চিনিক্ষেতের খুন আর ঘাম,
চিলির কয়লা আর তামার খনির মেয়েদের চোখের জল;
তারপর, ঝাঁকিয়ে নাও জোরসে,
দুটো বরফের টুক্‌রো দিতে ভুলো না,
ভুলো না ওর ভেতর মিশিয়ে নিতে
'রক্ষা করতে হবে খৃষ্ট সংস্কৃতি' এই গানের কয়েক ফোঁটা।
খুব তেতো হয়ে গেল কী?
অভ্যাস হয়ে যাবে, সৈনিক বন্ধু, এবার খেয়ে ফেলো।
দুনিয়ার যেখানেই যাও না কেন, রাতে কি প্রাতে,
যে বাবুয়ানির হোটেলেই থাক না কেন
দেহ মনকে সতেজ ও সবল-করা এই পানীয় চাইবে
আর দাম দেবে ওয়াশিংটনের তকমা-মারা একটা মোটা বিলে।

ষ্টালিনগ্রাদের পুনরুজ্জীবন, সোভিয়েট নরনারীর অনুপ্রেরণাময় শ্রম, আমাদের কারখানা আর গবেষণাগার, বাগান আর ক্ষেত, "সাদা স্কার্টের আর বৃক্ষহীন সমতল প্রান্তরে কপোতের পাখার শব্দ," "যারা মানচিত্রের রূপ বদলে দেয় সেই সব ইঞ্জিনিয়ার," যাকে কবি "স্বাধীন মানুষের মাতা" বলে অভিহিত করেছেন সেই দেশ—এদের সকলের গৌরব-গানে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে পাব্‌লো নেরুদা ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের অশরীরী ছায়াকে আহ্বান জানান।

পাব্‌লো নেরুদা আমেরিকানদের হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে, তারা যদি যুদ্ধ বাধিয়ে দেয় তা হলে দুনিয়ার সমস্ত জনগণ তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কবি তাকান সাধারণ আমেরিকান জনের দিকে, যে হ'ল

ভ্রম সংশোধন

এই সংখ্যায় 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধের দু'টি জায়গায় অসতর্কতাবশত দু'টি মারাত্মক ভুল থেকে গেছে। ঐ অংশে ৬৬ পৃষ্ঠার পর ৭৬ সংখ্যক পৃষ্ঠাটি এবং ৭৫ পৃষ্ঠার পর ৬৭ সংখ্যক পৃষ্ঠাটি ভ্রমক্রমে ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক, 'পরিচয়'।

চিলি বা মেক্সিকোর জুয়ানের ভাই। "যদি…" যদি আক্রমণকারী বর্ব্বরের দ আবার হামলা করে, তা হলে সবাই লড়বে তাদের বিরুদ্ধে। ফ্রান্সে আঙ্গুর ভরে উঠবে তীব্র ভিনিগারে। স্পেনের জলপাই কুঞ্জে যে আমে রিকান সৈন্য যাবে সে আর তার ওকলাহোমাতে কখনও ফিরবে না। সা পৃথিবী উঠে দাঁড়াবে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে।

পেরুর জনসাধারণ কামানের খোরাক হবে না। ইতালির জনমুক্তি সেনারা রুশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে না। বুলগেরিয়ার কৃষকেরা তাদের কর্ত্তব্য করে যাবে। "কিন্তু আরও এগিয়ে…"

…আরও এগিয়ে যাও, দেখবে
তুন্দ্রা ও তাইগার নরনারীরা দাঁড়িয়ে আছে তোমার প্রতীক্ষায়,
দীপ্ত, দৃঢ, ইস্পাতের মত কঠিন,
হাসিমুখে প্রস্তুত গান গাইতে অথবা লড়াইয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে।
দাঁড়িয়ে আছে ভল্গার মরণবিজয়ী যোদ্ধারা,
ষ্টালিনগ্রাদের মরদেরা, উক্রেইনের দানবেরা;
দাঁড়িয়ে আছে তারা পাথর ও রক্তের, লোহা ও গানের,
সাহস ও আশার এক বিশাল আকাশ-ছোঁয়া পাঁচিল হয়ে।
যদি এই দুর্গ-প্রাচীরে কখনও হাত দাও তুমি
তবে কারখানার পোড়া কয়লার মতো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে
রোচেষ্টারের হাসি ছায়া হয়ে ছড়িয়ে যাবে
মালভূমির বাতাসে,
তুষারে হবে তার চিরসমাধি।

কবি বলছেন যে আক্রমণকারীরা যদি "সাহস ও আশার পাঁচিল" স্পর্শ করতে সাহস করে, তা হলে "মুক্ত এটম গবেষণাগার-ত্যাগ করে আমেরিকার উদ্ধত শহরগুলোর উপ র আঘাত হানবে।"

এই হ'ল কবির সুতীব্র সাবধানবাণী। পাব্‌লো নেরুদা কিন্তু বিশ্বাস করেন যে জনতা সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র বান্‌চাল করে দেবে। উত্তর আমেরিকার জনগণের দিকে চেয়ে তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন দাসত্বের বিরুদ্ধে যিনি সংগ্রাম করেছিলেন সেই আব্রাহাম লিঙ্কনের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা :

এ সব ঘটে না যেন কিছুই।
রেলপথ-ভাঙ্গা মানুষেরা জাগো।
আজ আসুক তার কুঠার
আর কাঠের ঢাল নিয়ে,
চাষীদের সাথে সারি বেঁধে খেতে বসুক সে।
সিকোয়াদেরও উপরে,
গাছের পাতার ঝাড়ের উপর দিয়ে
সে তার গাছের বাকলের মতো রুক্ষ মাথায়
তক্তার গেরো অথবা ওক গাছের গোল দাগের মতো
চোখ দিয়ে পৃথিবীকে ফিরে দেখুক।
কিনুক সে কিছু ওষুধের দোকান থেকে
ট্যাম্পায় বাসে চড়ে যাক
হলুদ আপেলে কামড় লাগাক্,
সিনেমা বাড়ীতে ঢুকে সরল মানুষদের সাথে
কথা বলুক।
রেলপথ-ভাঙ্গা মানুষেরা জাগো

কবিতাটির শেষে পাব্‌লো নেরুদা শান্তির প্রশস্তি গান করেন, যে-শান্তির জন্যে সমস্ত জনতা লড়ছে। এখানে তাঁর কবিতা প্রাঞ্জল এবং তার ব্যাপ্তিও সুদূরপ্রসারী। পুনরুক্তির সাহায্যে এখানে তিনি অর্জ্জন করেছেন আবেগের বিপুল গভীরতা :

শান্তি চাই আগামী গোধূলিগুলির জন্যে,
শান্তি চাই পুলের জন্যে, মদের জন্যে,
শান্তি চাই আমার সেই সব কবিতার টুকরোর জন্যে
যেগুলো আমাকে তাড়া করে ফিরেছে আর
আমার পুরানো গানগুলিকে মাটি দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে
জড়িয়ে রক্তে উঠে আসতে চাইছে,
শান্তি চাই সকালের শহরের জন্যে যখন রুটীর ঘুম ভাঙ্গে,
শান্তি চাই সমস্ত নদীর উৎস মিসিসিপি নদীর জন্যে,
শান্তি চাই আমার ভাইয়ের পিরানটার জন্যে,

* * * *

শান্তি চাই কিয়েভের সেই বিরাট সমবায়-কৃষির জন্যে
শান্তি চাই সেইসব মৃতদের
আরো এইসব মৃতদের ভস্মের জন্যে
শান্তি চাই ব্রুকলিনের রুক্ষ কঠিন লোহার জন্যে,
যাতে তুমি বিয়ে করতে পার।
তাই বাড়ীতে বাড়ীতে ফেরে যে ডাকহরকরা চিঠি নিয়ে
প্রতিদিন দিনের মতই
শান্তি চাই তার জন্যে,
শান্তি চাই বিও-বিওর সমস্ত করাত-কলের জন্যে,
শান্তি চাই গেরিলা স্পেনের দীর্ণ-বিদীর্ণ হৃদয়ের জন্যে,
শান্তি চাই ইওমিং-এর সেই ছোট্ট জাদুঘরটির জন্যে,
যেখানকার সবচেয়ে চমৎকার জিনিস হচ্ছে
একটি বালিশ, হৃদয় দিয়ে কারুকাজ-করা,
রুটি যে বানায় তার জন্যে, আর তার প্রিয়জনদের জন্যে শান্তি চাই,
শান্তি চাই ময়দার জন্যে, শান্তি চাই আজও জন্মায়নি যে-গম
তার জন্যে,
তার মঞ্জরীর আশ্রয়ে যত ভালবাসা শান্তি চাই সবের জন্যে।
শান্তি চাই যারা বেঁচে আছে সবার জন্যে,
শান্তি চাই সমস্ত দেশ, সমস্ত সাগরের জন্যে।

এই সর্ব্বব্যাপী উপসংহারের পরে আরও আছে—সেটা হ'ল গীতি-কাব্যধর্ম্মী। এখানে কবি বলেছেন নিজের কথা, তাঁর হারানো দেশের কথা, তাঁর সযত্ন-লালিত আবেগের কথা। এখানে গভীরতার বদলে আছে ঘনিষ্ঠতার উত্তাপ। শেষ লাইনটি পর্য্যন্ত কিন্তু কবিতটি সংগ্রাম এবং আশারই কবিতা।

পাব্‌লো নেরুদা বিনয়ের সঙ্গে বলছেন যে, তিনি "সমাধান খুঁজে" দিতে চান না। তবু কিন্তু তিনি নিজের মতো করে এবং কাউকে অনুকরণ না করে আমাদের যুগের সবচেয়ে জরুরী একটা সমস্যার সমাধান করেছেন: সেটা হ'ল জনগণের শ্রম এবং সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত নতুন কাব্য সৃষ্টি। রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে মহৎ কবিতা মিল খায় না—'বিশুদ্ধ কবিতার'

প্রবক্তাদের এই নির্ব্বোধ এবং বিরক্তিকর যুক্তির জবাব দিয়েছে তাঁর চমৎকার কবিতা।

পাব্‌লো নেরুদা তাঁর কাব্য সৃষ্টি করে যেতে লাগলেন। 'দি ফিউ'-জিটিভ,' 'দি কংকুইসটাডোরস' এব্যং 'বেরিড ল্যাম্প' তিনি সংশোধন করে শেষ করলেন। 'রেলপথ-ভাঙ্গা মানুষেরা জাগো' এবং অন্যান্য কবিতার সঙ্গে এইগুলি মিলিয়ে তৈরী হয়েছে তাঁর "বিশ্বজনীন সঙ্গীত।" কবির নিজের ভাষায়, এই বইটি উৎসর্গ করা হ'য়েছে "প্রাচীন ও আধুনিক আমেরিকা, বিশেষ করে যে-দেশ আমার বুকের ভেতর এবং আমার কাজের ভেতর সব সময়েই আছে—" আমার সেই প্রিয় জন্মভূমি চিলির উদ্দেশে। তাঁর „বিশ্ব-জনীন সঙ্গীত" শীঘ্রই প্রকাশিত হ'বে।

ল্যাটিন-আমেরিকার রিপাবলিকগুলির রক্ত-লোলুপ কুকুরের দলের সামনে থেকে লুকিয়ে থাকতে কবি বাধ্য হয়েছেন। তাঁর খ্যাতি যতই বেড়েছে, তাঁর নির্য্যাতনকারীরাও ততই হন্যে হয়ে উঠেছে। আমি আর একবার বলে দিতে চাই, ঝড় ও বিপদে ভরা যে-জীবন যাপন করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন, তার সঙ্গে মিলিয়ে খাপ খাইয়ে নেবার মতো ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল না বললেই চলে।··· শিকারী কুকুরের মতো পুলিস তাঁকে অনুসরণ করে বেড়িয়েছে, তিনিও তাঁদের চোখে ধুলো দিয়ে পৃথিবীময় ঘুরেছেন, এবং তাঁর আদর্শের ওপর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বিশ্বাস না হারিয়ে আশ্চর্য্য কবিতা তিনি লিখে চলেছেন।

আর্জেন্টিনার 'লা হোরা' নামে একটি কাগজ তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিল। সেই সব প্রশ্নের জবাব ঐ পত্রিকাটি সম্প্রতি প্রকাশ করেছে। এই সব প্রশ্ন ও তার জবাবের মধ্যে কয়েকটি আমি তুলে দিচ্ছি, কারণ পাব্‌লো নেরুদা তার মধ্যে তাঁর কাজের কিছুটা হিসাব-নিকাশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন। আপনার রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের মূল কারণ কি?

উত্তর। আমার সাহিত্য সৃষ্টিতে একটা অচল অবস্থায় পৌঁছে আমি বেরোবার একটা ভালো পথ খুঁজে বার করতে চেয়েছিলাম; দুঃখের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যেই আমি সে-পথ খুঁজে পেয়েছি। অধ্যাত্মবাদ বা ধর্ম্মের ভাষায় যাকে দুঃখ বলা হয়ে থাকে এটা তেমন কোন দুঃখ নয়। যে সামাজিক অন্যায়ের অপরাধে মানুষ নিজেই অপরাধী, এটা হ'ল তারই ফল।

এই পথ এবং সংগ্রামই আমার কাছে সব চেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হ'ল। আমি এখন অনুভব করে থাকি যে আমি সত্যই আমার কর্ত্তব্য করছি। লেখক হিসাবে আমি শূন্য রাত্রে প্রাচীর ভেঙ্গে বেরুবার চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এখন আমি সুখী। আমাদের পথের মাঝখান দিয়ে চলতে হবে—চলতে হবে জীবনের দিকে। রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকে যে-লেখক সে হ'ল কল্পকাহিনীর জীব; সে-কল্পকাহিনী আবিষ্কার ও পোষণ করেছে ধনতন্ত্র। দান্তের যুগে এ-ধরনের কোন কবি ছিলেন না। "শিল্পের জন্যেই শিল্প"—বড় ব্যবসায়ীদের তরফ থেকেই এই মতটা প্রচার করা হয়। থিয়োফাইল গতিয়ের ধনী ব্যবসায়ী ও শোষকদের আদর্শের গুণকীর্ত্তন করেছেন। লেখকেরাও যে এই মত গ্রহণ করেছিলেন—সেটা হ'ল উঠ্‌তি ধনতন্ত্রের পক্ষে জয়। আর্থার রিম্বোর মতো বড় বিদ্রোহীর ইথিওপিয়ায় পলায়ন হ'ল শালভিলের মাংসের ব্যবসায়ীদের অবিসংবাদিত জয়।…আমাদের একটা আলাদা জগৎ গড়তে হবে…সেটা এত শোক দুঃখে ভরা থাকবে না—তা হবে সুখের জগৎ। তার জন্যে লেখককে হতে হবে এক বিরাট বাহিনীর অনুগত সৈনিক। তাকে না থেমে বা এদিক-ওদিক না করে এগিয়ে চলতে হবে।

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন যে আপনি স্থায়ীভাবে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন, না, সেটা হ'ল ক্ষণিক ভাবাবেগ অথবা সাময়িক ঘটনাচক্রের তাগিদে।

উত্তর। আমার মনে হয়, আপনারা আমার বইয়ে আর অনেক দোষ পেতে পারেন—পাবেন না শুধু একনিষ্ঠতার অভাব চিলির জনসাধারণ যেভাবে মুরগীর খাঁচার মতো বাসায় ঠাসাঠাসি করে বাস করে তা দেখলে আপনারা বুঝতে পারতেন যে, এই পথ এবং এই সংগ্রাম বেছে নিয়ে আমি আর পিছু ফিরতে পারি না।

প্রশ্ন। "পূর্ব্ব" ও "পশ্চিম" এই দুই ভাগে জগতকে যে বর্ত্তমানে ভাগ করে দেখানো হচ্ছে, সে-সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আপনি কি মনে করেন যে একটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন?

উত্তর। হিটলার ও গোয়েবল্‌স্—এই সব চতুর জল্লাদেরাই "পশ্চিমী" সভ্যতার মিথ্যাটা নিজেরা বানিয়ে প্রচার করেছিল। এই ধন্বন্তরি সদৃশ সর্ব্বরোগহর ওষুধটি তৈরী করে বোতলে ভরে বাজারে ছেড়েছিল

তারাই; এখন মার্শাল, ফোর্ড মোটরস, কোকা-কোলা এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল অথবা ফ্লাইং ফোরট্রেস তৈরী-করনেওয়ালাদের ওপর নির্ভরশীল নিঃস্বার্থ দার্শনিক প্রবরেরাই এই দাওয়াইটি যথেচ্ছভাবে সরবরাহ করে যাচ্ছেন।…ক্ষুধা এবং অনশন—তা সে ভারতবর্ষ বা পশ্চিমী রাজধানীগুলির শহরতলী যেখানেই থাকুক না কেন—আমার কাছে সমানই পীড়াদায়ক। ব্যবসায়ে মুনাফা সঞ্চয় করাই হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন; তার চেয়ে সোভিয়েটের গবেষণার প্রেরণা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি অবিসংবাদিত ভাবে ঢের বেশী প্রগতিশীল ও সার্থক বলে আমি মনে করি। যারা সোভিয়েট অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধে নেবেছিল, যারা মার্কসবাদী বই পড়েছিল, যারা ছিল কমিউনিষ্ট পার্টির সার্থক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত—তারাই যে মানবসংস্কৃতিকে মারাত্মক বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল একথা ষ্টালিনগ্রাদ প্রমাণ করে দিয়েছে। চায়কোভস্কি, মার্ক্‌স্, বাখ, শেক্সপীয়র, পুসকিন, গয়া, পাবলভ—এঁদের সৃষ্টি এবং চিন্তা সবই সারা মানবজাতির। সংস্কৃতিকে ভাগ করে ফেল—এই রকমই হ'ল সাম্রাজ্যবাদীদের কুৎসিত প্রচার। আধুনিক যুগের প্রহসন হ'ল এই যে, দুর্নীতিদুষ্ট চিয়াং-চক্রকে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বজাধারী বলে প্রচার করা চলেছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে থিওক্রিটাস যাদের নিয়ে গান করে গেছেন গ্রীসের সেই কৃষকদের হত্যা করে চলেছে মার্কিন বাহিনীর অফিসাররা। ভণ্ডের দল!…সেনর গঞ্জালেস ভিডেলা নিজেই একজন "পাশ্চাত্য শুদ্ধিদাতা"—এবং তাঁর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলেছে তা হ'ল 'এশিয়াই কাণ্ড'! অন্য সময় হলে আমরা এটা হেসেই উড়িয়ে দিতে পারতাম। আবার যে যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা আছে এ কথাটা এই কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত আমি মনে করতাম না। কিন্তু যারা বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখেছে বোমা, ওয়াল ষ্টীটের সেই সব মাইনে-খেকো সৈনিকদের দেখে আশঙ্কা হচ্ছে; তারা এর পরে যে কি করবে তা অনুমান করা শক্ত, কারণ আজ তারা মুখোমুখী হয়েছে হুঁশিয়ার জনতার; সেই জনতা চাইছে উন্নততর জীবন, পূর্ণতর অধিকার। ওয়াল ষ্ট্রীটের এই সব মশায়দের দেখে আপনার মনে পড়বে এমন কোন কৃপণের কথা যে তার মৃত্যুশয্যায় হঠাৎ বুঝতে পারে তার লোভের ব্যর্থতা!… মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-দপ্তর সুপরিকল্পিতভাবে এবং দুর্ব্বৃত্তের মতো আমেরিকাকে একটা নতুন যুদ্ধের জন্যে তৈরী করছে। কিন্তু কি আমাদের জণগণ কি অন্য কোন দেশের জনতা—

এদের কেউই যে যুদ্ধ চায় না সে-সম্পর্কে কোন তর্কই উঠতে পারে না। এই পূর্ব্বকল্পিত দুষ্কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্ত্তে লড়াই করাই হচ্ছে আমাদের কর্ত্তব্য।

আমি এই কথোপকথন থেকে অনেকখানি তুলে দিলাম এইজন্যে যে, উত্তর আমেরিকার দস্যুরা যুদ্ধের যে-আয়োজন চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামই আজ পাব্‌লো নেরুদার অস্তিত্বের কৈফিয়ৎ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গত গ্রীষ্মকালে রোকলো শহরে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে পাব্‌লো নেরুদার পুরানো বন্ধু পাবলো পিকাসো তাঁর বক্তৃতায় সুতীব্রভাবে নিন্দা করেন সেই সব লোককে যারা এই মহান কবিকে নিপীড়ন করতে সাহস পেয়েছে। এই বক্তৃতার সমর্থনে সমস্ত শ্রোতা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ওঠে, এবং পাব্‌লো নেরুদার প্রতি অভিনন্দনের প্রতিধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হয়ে ওঠে।

প্যারিসের শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন তখন শেষ হয়ে আসছিল। ১৯৪৯ সালের ২৫শে এপ্রিল ছিল তার শেষ অধিবেশন। হঠাৎ সমস্ত হ'লে একটা গভীর উত্তেজনার সঞ্চার হ'ল: পাব্‌লো নেরুদা তখন বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাঁড়াচ্ছেন। আমেরিকার পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। সৈনিক যেভাবে রণক্ষেত্রে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে যায়, সেইভাবে তিনি বক্তৃতামঞ্চে উঠলেন; তিনি জানতেন যে শান্তির জন্যে, মানুষের মর্য্যাদার জন্যে, কাব্যের জন্যে মহান সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। তিনি তাঁর শেষ লেখা কবিতাগুলির মধ্যে একটি পড়লেন; আর স্কটল্যাণ্ডের খনিশ্রমিকরা, কোরিয়ার শিক্ষয়িত্রী, জোলিও-কুরি, পোল্যাণ্ডের রেলশ্রমিক, সোভিয়েটের বিখ্যাত বৈমানিক মেরেসিয়েভ—বিভিন্ন দেশের, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ সকলেই উৎসাহের সঙ্গে শুনল তাঁর কথা—ভাষা তার দুর্ব্বোধ্য হ'লেও শ্রোতাদের হৃদয় তাতে সাড়া দিল ঠিকই। ফ্রান্সের একজন শ্রমিক আর থাকতে না পেরে আনন্দের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল: "পাব্‌লো নেরুদা! সত্যিই পাব্‌লো নেরুদা যে!"

এই সাক্ষাৎকারের কথা সত্যই বর্ণনা করা যায় না, এবং আমি এখানেই থামবো। পাব্‌লো নেরুদা কোথায় আছেন তা আমরা জানতাম না, অথচ তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যেই। তাঁকে আমি জড়িয়ে ধরলাম আর তাঁর শেষ বইয়ের পাণ্ডুলিপি খুলে ফেললাম। আমাদের মধ্যেই তিনি আছেন —আছে তাঁর সাহস, তাঁর বন্ধুত্ব, তার আশ্চর্য্য মহাপ্রাণ কবিতা।

ইলিয়া ইরেনবুর্গ

যুদ্ধবাদীদের 'শান্তিবাদী' ভণ্ডামী

"আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের জন্য জনগণের আন্দোলন প্রতিদিন আরও জোরদার হচ্ছে; যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি এবং গণতন্ত্রের শিবির এক প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হয়েছে।...

"শান্তির সমর্থকদের স্বর দিনের পর দিন আরও জোরদার হয়ে উঠ্‌ছে; জাতীয় স্বাধীনতা বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার জন্য, পরদেশ আক্রমণকারী এবং যুদ্ধকামীদের বিরুদ্ধে জনতার বিপুল আন্দোলন দিনের পর দিন আরও ছড়িয়ে পড়ছে।...

"এই বিপুল শান্তি আন্দোলন প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, পরদেশ আক্রমণকারীদের রোধ করার ক্ষমতা জনগণের আছে।...

(আর তা সত্ত্বেও) "যদি সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ সুরু করে তাহলে এবার আর শুধু কয়েকটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই নয়, সমস্ত পুঁজিবাদী দুনিয়াই খতম হয়ে যাবে।"

[নভেম্বর দিবসে কমরেড ম্যালেন্‌কভের বক্তৃতা]

এমন এক সময় ছিল যখন যুদ্ধবাদীদের সর্দ্দার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ মনে করত যে এটম বোমার ভয় দেখিয়ে আর বিভিন্ন দেশের বিশ্বাসঘাতক পুঁজিবাদী সরকারগুলোকে ডলার মুষ্টি দিয়ে কিনে নিয়েই সে নির্ব্বিঘ্নে কাজ হাসিল করতে পারবে, তার যুদ্ধ-পরিকল্পনাকে সফল করতে পারবে। ডলারপতিদের মাইনে করা সেনাপতি আর দালালরা কথায় কথায় যুদ্ধং দেহি বলে তাল ঠুকতো। কিন্তু সেদিন আর নেই। সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তি অভিযান দুর্ব্বার হয়ে উঠেছে। এটম বোম নিয়ে আস্ফালন করার উপায়ও এখন আর নেই। যুদ্ধবাদীদের নেতা, সমস্ত দেশের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের প্রধান শত্রু হিসাবে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ প্রকাশ হয়ে গেছে। তার যুদ্ধনীতি, তার পরদেশ লালসার বিরুদ্ধে প্রতিটী দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের প্রতিরোধ তীব্র থেকে

তীব্রতর হয়ে উঠছে। যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই—এই আওয়াজ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোটি কোটি মানুষের রণধ্বনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অভিযানের মধ্যে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ দেখছে তার এবং তার অনুচর অংশীদারদের মৃত্যু পরোয়ানা। একে রোধ করার জন্যে সে নতুন হাতিয়ার প্রয়োগ করছে—শান্তিবাদ। সরাসরি যুদ্ধের কথা বলে যে জনগণকে সে হারিয়েছে, শান্তির বুলি আওড়ে তাদের সে ফিরে পেতে চায়। তাই, তার দালালরা যুদ্ধসাজের ওপর শান্তিবাদের নামাবলি জড়িয়ে এসে হাজির হয়েছে মুখে অহিংসার বুলি নিয়ে। যুদ্ধবাদী সাম্রাজ্যবাদের এই দালালরাই সম্মেলন করছে শান্তিনিকেতনে, আর ওয়ার্দ্ধায়।

সারা দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের যে সংকট, ভারতে তাদের অনুচর কংগ্রেসীদের সংকট তার চেয়ে কিছু কম নয়। এদের দেশপ্রেম, নিরপেক্ষতা আর অহিংসার ভাঁওতাও ফাঁস হয়ে গেছে। এরা যে ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের রক্ষক, ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার, তাদেরই নির্দ্দেশে এদেশকে যুদ্ধঘাঁটিতে পরিণত করছে, সে কথা আজ সমস্ত দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এদের দেশবেচা যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে জলন্ত ঘৃণায় সারা দেশ ফেটে পড়ছে। সারা ভারত শান্তি সম্মেলন উপলক্ষে কলকাতার ২ লাখ মেহনতী জনতার যুদ্ধবিরোধী সমাবেশে এদের বুক কেঁপে উঠেছে। শান্তিকামী জনগণের ক্রোধের আগুন থেকে বাঁচবার জন্যে তাই কংগ্রেসী যুদ্ধবাদীরাও শান্তিবাদের ভেক ধরেছে। তারাই হয়েছে এই শান্তিবাদী ভণ্ডামীর প্রধান উদ্যোক্তা—কংগ্রেসী মন্ত্রী হয়েছেন সভাপতি, প্রতিনিধিরা সবাই রাজ-অতিথি, সরকারী বেতার তার প্রধান প্রচারক, আর সরকারের দখলকরা নিজাম প্রাসাদ তার অধিবেশনের জায়গা। সম্মেলনের সংগঠন কমিটির ভাষায়, 'বাছাই করা' বিশ্বস্ত শান্তিবাদীরা শুধু এই সম্মেলনে যোগ দেবার অধিকারী। প্রতিনিধিদের পরিচয় পেলে সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই থাকে না। অনেক বাছাই না করলে সাম্রাজ্যবাদীদের এতগুলি এমন বিশ্বস্ত চর, অনুচর এবং গুপ্তচর যোগাড় করা কঠিন।

সম্মেলনের প্রধান পাণ্ডা মিঃ হোরেস আলেকজাণ্ডারের কথাই ধরা যাক। তিনি স্বনামধন্য পুরুষ। এদেশের লোকের কাছে তাঁর কীর্ত্তিকলাপ সুপরিচিত। গতযুদ্ধের সময় আলেকজাণ্ডার সাহেব এদেশেই ছিলেন, 'ফ্রেণ্ডস্ এম্বুলেন্স ইউনিট' নামে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা হিসাবে।

সে সময় শান্তিবাদী আলেকজাণ্ডার সাহেবের প্রচারের প্রধান বাহন ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের গোঁড়া সমর্থক ষ্টেটসম্যান কাগজ। তখন এই ব্যাপারটা অনেকের কাছে রহস্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর কয়েকটা ঘটনায় সে রহস্যের সমাধান হয়েছে, প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আলেকজাণ্ডার সাহেবের সেবাপ্রতিষ্ঠানই ছিল আসলে বৃটিশ যুদ্ধ বিভাগের গুপ্তচরদের একটি আড্ডা। আলেকজাণ্ডার সাহেবর প্রধান সহকারী মিঃ সাইমণ্ডস বর্ত্তমানে সেবাব্রত ছেড়ে জাতিসংঘের কাশ্মীর কমিশনের সেক্রেটারী হিসাবে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধঘাটি গড়ছেন। অন্য একজন সহকর্মী মিঃ গ্রোভস্ বর্ত্তমানে এদেশে সরকারী বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের একজন কর্ত্তা,। এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের সম্পর্ক যে কতখানি ঘনিষ্ঠ সে কথা আর কেনা জানে। আর আলেকজাণ্ডার সাহেব স্বয়ং তাঁর সেবাপ্রতিষ্ঠানের পুরানো অফিস ১নং উড্ ষ্ট্রীটের সাইনবোর্ড বদ্‌লে শান্তিবাদীদের অফিস করেছেন। সেবাব্রতের সাথেই হোক, আর শান্তিব্রতেই সঙ্গেই হোক—আসল ব্রতটি উদ্ধার হোলেই তাঁর প্রভুরা সন্তুষ্ট।

আমেরিকা থেকে এসেছেন ১৫ জন শান্তিবাদী। সম্মেলনে এ পর্য্যন্ত এদের গলাটা একটু কম শোনা গেছে। তার কারণ বোধ হয় এই যে সারা ভারত শান্তি সম্মেলনে সোভিয়েট প্রতিনিধির আসা বন্ধ করে শান্তিবাদী সম্মেলনে ১৫ জন আমেরিকান প্রতিনিধিদের নিয়ে বেশী ঢাক পেটানটা তেমন ভাল দেখাবে না বলে সংগঠকরা মনে করেছেন। আর তাছাড়া যুদ্ধের হুংকার ছাড়তে অভ্যস্ত এই আমরিকানদের শান্তিবাদের নতুন সুরটা এখনও বোধ হয় তেমন রপ্ত হয়নি। কিছুদিন আগে জেনেভার আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির সভায় সোভিয়েট প্রতিনিধি যখন প্রস্তাব আনেন যে মানবতার দিক থেকে এটম বোমা ব্যবহার এবং বীজাণু যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হোক, তখন আমেরিকান রেডক্রশের প্রতিনিধি সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এই আমেরিকান রেডক্রশের অন্যতম প্রধান সংগঠক ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস সোসাইটির নেতারাই এসেছেন শান্তিবাদী সম্মিলনে প্রতিনিধি হয়ে। এটম বোমা আর বীজাণু-যুদ্ধের সমর্থন থেকে এত অল্পসময়ের মধ্যে শান্তিবাদ আর অহিংসার ভেক ধরে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হবারই কথা।

চীন থেকে যে শান্তিবাদীটী এসেছেন তিনি চিয়াং এর সমর্থক। চিয়াংএরই সঙ্গে দেশ ছাড়া।

জাপান থেকে শান্তিবাদী হয়ে এসেছেন যে দু'জন, তাঁরা আগে ছিলেন টোনো প্রভৃতির সমর্থক, এখন স্বভাবতই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সাফাইদার। এক সাংবাদিক সম্মেলনে এঁরা বলেন যে "যুদ্ধের পর (আমরা) পরিপূর্ণ শান্তির ভিত্তিতে নয়া জাপান গড়ান কাজে হাত দিয়েছি।" সারা জগৎ জানে যে একথা মিথ্যা। আমেরিকা জাপানকে গড়ে তুলছে সোভিয়েট আর চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘাঁটি হিসাবে। একজন সাংবাদিক চেপে ধরায় তখন জাপানী শান্তিবাদী দু'জন উত্তর দেন : কথাটা ঠিক, কিন্তু আমরা পরাধীন, আমরা আর তাতে কি করতে পারি?" অর্থাৎ এই শান্তিবাদীদের মতে পরাধীন জাতি তার নিজের স্বাধীনতা অপহরণকারী সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ-নীতির বিরুদ্ধে লড়তে পারে না, কিন্তু বিদেশে গিয়ে সেই নীতিকে শান্তি-নীতি বলে মিথ্যা প্রচার করতে পারে।

জার্ম্মান প্রতিনিধিরা নিজেই স্বীকার করেছেন যে, মাদ্রিদে বৃটিশ রাজদূতের চেষ্টায় তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। তারপর নিশ্চয়ই সেই বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকদেরই নির্দ্দেশে জার্ম্মানীর রুশ-অধিকৃত অঞ্চলে অধ্যাপক-গিরি সুরু করেন। ছেলে পড়ানর সঙ্গে সঙ্গে আর কি কি কাজ করে তিনি বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকদের নুনের শোধ দিতেন তা নিজে প্রকাশ করে না বললেও বোঝা কষ্টকর নয়। কারণ, কিছুদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে তাঁর চাকরী যায়। এখন ইনি জার্ম্মানীর ইঙ্গ-মার্কিণ অঞ্চলে তরুণ নাৎসীদের শিক্ষাদাতা। প্রাক্তন নাৎসীদের ভবিষ্যৎ ইঙ্গ-মার্কিণ রংরুট হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব যার ওপর তিনি যে মস্তবড় শান্তিবাদী তাতে আর সন্দেহ কি?

এহেন শান্তিবাদীরা যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য কি পরামর্শ দেবে তা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হবার কোন কারণ নেই। শান্তিবাদী-প্রধান হোরেস আলেকজাণ্ডার পরামর্শ দিয়েছেন : "বর্ত্তমান অবস্থায় শান্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারকে পরামর্শ দেওয়া অপেক্ষা শান্তিকামীরা নিজেরা কি করিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা অধিক সঙ্গত।

দুনিয়ার শান্তিকামী জনগণ যুদ্ধের নায়ক আমেরিকান আর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার আর তাদের তাঁবেদার পুঁজিবাদী সরকারগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেছে। সে অভিযান বন্ধ করে তারা যদি এখন শান্তিবাদী কায়দায় আত্মপরীক্ষায় লেগে যায়, তা হলে সেটা সঙ্গত হয় নিশ্চয়ই—যুদ্ধবাদীদের পক্ষে।

প্রকৃত 'শান্তিবাদী' কে—তার ব্যাখ্যা করে আলেকজাণ্ডার সাহেব

বলেছেন : "জীবনে হিংসার সম্মুখীন হইয়াও প্রতিক্ষেত্রে তাহাকে রোধ করার জন্য হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করিতে যে ব্যক্তি স্থির করিয়াছে তাহাকে শান্তিবাদা বলা যায়"। এরকম 'প্রকৃত শান্তিবাদী'র সংখ্যা যত বাড়ে যুদ্ধবাদীদের ততই আনন্দ। শান্তিকামী জনগণ আজকাল তাদের বড়ই অসুবিধার সৃষ্টি করছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে যখনই তারা মজুরের মজুরি কাটার বা ছাঁটাই করার চেষ্টা করছে, কৃষকের ফসল কাড়ার বা উদ্বাস্তদের কুঁড়ে থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে, অথবা পুলিশ মিলি-টারীকে দিয়ে শান্ত প্রতিষ্ঠা করাতে চাইছে—অমনি বেআদপ কৃষক, মজুর, ছাত্র, শিক্ষকের দল রুখে দাঁড়াচ্ছে, যা পাচ্ছে তাই দিয়ে প্রতিরোধ করছে। যুদ্ধবাদাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এখন জনগণ শান্তিবাদী ভণ্ডদের পরামর্শ শুনে যদি দেশী বিদেশী যুদ্ধবাদীদের হিংস্র আক্রমণের যথাসাধ্য প্রতিরোধ না করে, তাহলেই যুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্র নির্ব্বিঘ্নে সফল হয়। পুঁজিপতিদের দালালরা 'শিল্পে শান্তি'র নামে শ্রমিকদের বলে মালিকের জুলুমের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। আবার তারাই 'শান্তিবাদীর' সাজ পড়ে জনগণকে উপদেশ দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতিকে বাধা না দিতে।

এরা আওয়াজ তুলছে—"বিশ্বশান্তির জন্য চাই এক অখণ্ড বিশ্ব-সরকার (World Government)।" বলা বাহুল্য 'শান্তিবাদী'দের এ আওয়াজটিও আমেরিকান যুদ্ধবাদীদেরই দাবী। ১৯৪৭ সালে কমরেড ঝানভ, 'আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি' সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক রিপোর্টে এই আওয়াজ সম্বন্ধে বলেছিলেন : "ইউরোপকে শিকল দিয়ে বাঁধার মতলবের সঙ্গে সঙ্গে মতবাদ নিয়ে যে সব অভিযান তারা (মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা) চালায়, তার মধ্যে একটি হোল জাতীয় সার্ব্বভৌমত্বের নীতিকে আক্রমণ করা, আর "অখণ্ড বিশ্ব সরকারের" দোহাই দিয়ে বিভিন্ন জাতির সার্ব্বভৌম অধিকার পরিত্যাগ করা উচিত বলে আবেদন করা। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হোল, যে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন জাতির সার্ব্বভৌম অধিকারকে নির্ম্মমভাবে দলন করছে তার অবাধ পররাজ্যলিপ্সাকে মুখোস দিয়ে ঢাকা, আমেরিকাকে বিশ্বব্যাপী শাসন ব্যবস্থার মুখপাত্র বলে ঘোষণা করা এবং যারা মার্কিণ ক্ষমতা বিস্তারের বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে বাতিল "স্বার্থান্ধ" জাতীয়তার অপবাদ দেওয়া। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে যারা বিকৃতমস্তিষ্ক আর যারা নিছক শান্তিবাদী তারা "অখণ্ড

বিশ্বসরকার'-এর রবটিকে গ্রহণ করেছে। যেসব জাতি তাদের নিজস্ব স্বাধীনতাকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করছে, তাদের ওপর মতবাদগত চাপ দেবার জন্য এই আওয়াজকে তো ব্যবহার করা হচ্ছেই। সঙ্গে সঙ্গে যে সোভিয়েট ছোট বড় সকল জাতির সার্ব্বভৌম অধিকার এবং প্রকৃত সাম্য স্বীকার করে নেওয়ার নীতির স্বপক্ষে অক্লান্তভাবে অবিচলিত চেষ্টা করছে, সেই সোভিয়েটের বিরুদ্ধে একটা বিশেষ আওয়াজ হিসাবেও এই আওয়াজকে ব্যবহার করা হচ্ছে।"

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে জাতিসংঘে সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী কমরেড ভিশিন্স্কী এই বিশ্ব-সরকার প্রতিষ্ঠার আওয়াজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে বলেন ঃ

"পুঁজিবাদের বিকাশ, বিশেষ করে পুঁজিবাদ তার উচ্চতম স্তরে সাম্রাজ্যবাদের যুগে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসে প্রভুত্ব এবং পরদেশগ্রাসের এক প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু এর থেকেই আবার, যে সব জাতির জাতীয়তাবোধ জেগে উঠছে তাদের ভেতর থেকে ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিরোধ দেখা দেয়। এই প্রতিরোধ সহজেই বিপজ্জনক ব্যাপারে এবং বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধে অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বনে পরিণত হতে পারে।... কিন্তু যেসব দেশ অর্থনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, নিজেদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবের এলাকা বিস্তারের চেষ্টা করছে, তাদের কাছে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রগত সার্ব্বভৌমত্ব একটা বাধাস্বরূপ।... রাষ্ট্রগত সার্ব্বভৌমত্ব হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে বহু, বহু জাতির স্বাধীনতা এবং সংগ্রামের নিশান।"

যুদ্ধবাদীদের সর্দ্দার মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের 'আদর্শগত' হাতিয়ার হোল এই "অখণ্ড বিশ্বসরকারের" আওয়াজ। ইউরোপে এই আওয়াজের প্রধান প্রচারক হলেন ফ্রান্সের ব্লুম, বৃটেনের বেভিন প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতক দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতারা, যারা নিজ নিজ দেশকে বিকিয়ে দিয়েছে ডলারপতিদের কাছে। আমাদের দেশে এই আওয়াজ প্রকাশ্যে প্রথম তুলেছিলেন কোটিপতি ডালমিয়া। তারপর মার্কিণ-পার্টি ভারতীয় কংগ্রেসের নেতা নেহরু এই আওয়াজ তোলেন ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাঁর বেতার বক্তৃতায়। সেই কথাই আজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ট্রুম্যান-এটলি-নেহরুর দালাল এই 'সাম্যবাদী'দের মুখে।

রতনেই রতন চেনে। এই যুদ্ধবাদী শান্তিবাদীরাও স্বভাবতই গান্ধীবাদকে তাদের মূলমন্ত্র হিসাবে প্রচার করছে। গান্ধীবাদী অহিংসা ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্রেণী-মতবাদ। শাসক এবং শোষকদের সংগঠিত হিংসার বিরুদ্ধে সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষকের জাগ্রত প্রতিরোধকে "অহিংসার" নামে নিরস্ত্র করার জন্যই এই মতবাদের সৃষ্টি। গান্ধী স্বয়ং চোরিচৌরায় জনতার হিংসার অজুহাতে বৃটিশ-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানকে পেছন থেকে ছুরি মেরেছিলেন, কিন্তু সেজন্য বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের ওপর কংগ্রেসী গুলির সমর্থন করতে তাঁর অহিংসায় বাধে নি। গান্ধীবাদী শান্তিবাদ এমনই চমৎকার যে এর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আড়কাঠিগিরি করার কোনই অসুবিধা হয় না। গান্ধী স্বয়ং সে কথা প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন বুয়ের যুদ্ধের সময়, ১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময়। গুরুর এই আদর্শের অনুসরণ করেই এ দেশের বর্ত্তমান "গান্ধীবাদী অহিংস" শাসকরা যুদ্ধরসদ যোগাচ্ছে বর্ম্মার থাকিণ ন্যু'কে, গুর্খা সৈন্য পাঠাচ্ছে মালয়ে ম্যাকডোনাল্ডের সাহায্যে, আর নিজেদের দেশকে পরিণত করছে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধঘাঁটিতে।

এমনি শান্তিবাদী যুদ্ধ-আড়কাঠির আজ সাম্রাজ্যবাদের ভীষণ দরকার। সোভিয়েট, চীন, মধ্য এবং পূর্ব্ব ইউরোপের ৪০ কোটি মানুষের দেশে সাম্রাজ্যবাদ খতম হয়ে গেছে। মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, বর্ম্মায় মুক্তিকামী জনগণ হাতিয়ার হাতে লড়তে সুরু করেছে, সাম্রাজ্যবাদী অট্টালিকার স্তম্ভের পর স্তম্ভ চুরমার হয়ে গেছে সশস্ত্র গণশক্তির আঘাতের পর আঘাতে। জনতার এই দুর্ব্বার অভিযানকে রোখা দরকার, তাকে নিরস্ত্র করা দরকার। সশস্ত্র জনগণকে ভাঁওতা দিয়ে অস্ত্রত্যাগ করান দরকার। নইলে যুদ্ধবাদীদের সমস্ত আশা ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে। তাই যুদ্ধবাদীরা এখন শান্তিবাদী সেজে গান্ধীবাদী অহিংসার রামনাম সুরু করেছে। কিন্তু বৃথা আশা! এত ঢাক পিটিয়েও এরা কোন প্রকাশ্য সভায় নিজদের বক্তব্য হাজির করতে সাহস পায় নি। এরা জানে সেরকম সভায় জনতা এদের শান্তিবাদী ভণ্ডামিকে কি রকম অভ্যর্থনা জানাবে। অহিংসা সম্পর্কে বড় বড় বক্তৃতা করে এরা শেষ পর্য্যন্ত প্রস্তাব করেছে যে নেহরু সম্মেলনে এলে প্রদেশিক সরকার তাঁর "রক্ষার" জন্য প্রয়োজনীয় সশস্ত্র ব্যবস্থা করতে পারে। এই ভাবে এরা নিজেরাই ঘোষণা করে দিয়েছে যে, অস্ত্রই এই যুদ্ধবাদীদের একমাত্র ভরসা, শান্তির বুলি ভণ্ডামী মাত্র।

ইতিহাসের অনিবার্য্য গতি বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদকে তার অনিবার্য্য পরিণিতির দিকে—নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। ভেতরে এবং বাইরে তার সংকটই উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক সংকটের বন্যা সারা পুঁজিবাদী দুনিয়াকে গ্রাস করছে। সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার শক্তি বেড়েই চলেছে। চীনা জনগণের বিজয় অভিযান সারা এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামকে আরও দুর্ব্বার করে তুলেছে। তার সমস্ত অস্ত্রবল চূর্ণ করে,

ন্যা-হাতা-বাও দাই-এর বিশ্বাসঘাতকতাকে অস্বীকার করে, বর্ম্মা, ইন্দোচীন ইন্দোনেশীয়ার জনগণ সাম্রাজ্যবাদের কবর রচনা করছে, তার যুদ্ধচক্রান্তকে চূর্ণ করে দিচ্ছে।

আর তা সত্ত্বেও সে যদি যুদ্ধ বাধায় তাহলে 'এবার আর একটা পুঁজিবাদী দেশ নয়, সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই খতম হয়ে যাবে' (ম্যালেনকভ্)।

"সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায়না", যুদ্ধকে তারা ঘৃণা করে। তারা ক্রমেই বেশী করে বুঝতে পারছে, কী ভীষণ গহ্বরের দিকে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে!

"সোভিয়েট ইউনিয়নের, নয়া গণতন্ত্রগুলির ও আন্তর্জাতিক মজুরশ্রেণীর অবিশ্রাম লড়াই এবং উস্কানীদাতাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি দুনিয়ার সমস্ত দেশের জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশের সমর্থন রোজই আরো বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠ্ছে।

"তাই গড়ে উঠেছে আজ শান্তির সৈনিকদের এক জোরদার আন্দোলন। ৬০ কোটিরও বেশী মানুষের এই অন্দোলন ক্রমেই বেড়ে চলেছে, ব্যাপক হচ্ছে, সমস্ত দুনিয়াতে পরিব্যপ্ত হচ্ছে, যুদ্ধের বিভীষিকার বিরুদ্ধে নিত্য নূতন যোদ্ধাদের যোগদানে পরিপুষ্ট হচ্ছে।

"শান্তির সৈনিকদের আন্দোলন থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, শান্তিকে রক্ষা করার দায়িত্ব জনসাধারণ নিজদের হাতে নিচ্ছে, দেখিয়ে দিচ্ছে শান্তির আদর্শকে অম্লান রাখতে ও যুদ্ধ রুখতে তারা অটল।

"কিন্তু তবু, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আজ যে নূতন যুদ্ধের আয়োজন করছে তার বিপদকে ছোট করে দেখা ভুল হবে, শান্তির পক্ষে হবে ক্ষতিকর।

"গণতন্ত্রে ও সমাজতন্ত্রের শিবিরের প্রচণ্ড শক্তিবৃদ্ধিতে শান্তির সত্যকার সৈনিকদের মাঝে যেন আত্মসন্তোষের সৃষ্টি না হয়।

"যুদ্ধের বিপদ কমে গেছে মনে করলে গভীর ও অমার্জনীয় ভ্রম করা হবে।

সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে ঘটনাস্রোত যতই নৈরাশ্যজনক হয়ে ওঠে, ততই তারা ক্ষেপে ওঠে, সামরিক হটকারিতার বিপদ আরও বেশী হয়। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায়। তাই জনসাধারণের প্রাণপন সতর্কতা ও শান্তির জন্য সর্বতোভাবে সক্রিয় লড়াই চালানর অটল সংকল্পই কেবল নূতন যুদ্ধের উস্কানীদাতাদের সয়তানী চক্রান্ত ব্যর্থ করতে পারে।—'ফর লাষ্টিং পীস্ এ পীপল্‌স্ ডেমোক্রাসী'।

—আব্দুল কাদের বিশ্বাস

STORM : ILLYA EHRENBURG Rs. 7/8/-

EHRENBURG'S famous novel published after the 'Fall of Paris'. The novel portrays Europe during the Second World War and just after the war. The resistance movement of France and the heroism and sacrifice of millions and millions of Soviet people revealed glaringly. This book is a clear example of the vigour and growth of Socialist realist literature.

The strength, vigour and invincibility of the mighty and all powerful idea of Communism is the main source of inspiration. The maturity and perfection of the artist himself.

MEN WITH A CLEAR CONSCIENCE :
P. VERSHIGORA Rs. 3/12/-

A Stalin Prize Novel of the 1946. The theme of the novel is the incidents of the last war. This is a narrative of people and events leading and inclusive of famous Stalin Raid, behind enemy lines, effected under the direct iustructions of Comrade Stalin. It is here the heroism and sacrifice of the Soviet people can be found, keeping everything at stake to defend the Socialist Fatherland.

: GORKY : SELECTED WORKS Vol 1
Rs. 7/8/-

Can be obtained from :

NEW PUBLISHERS
6, Bankim Chatterjee St., Calcutta 12.

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় কর্ত্তৃক রচিত

কাব্যে শকুন্তলা— সাড়ে তিন টাকা, ব্রজ বাঁশরী—আড়াই টাকা

শ্রী নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত—সেই পুরাতন প্রেম —১৷০

শ্রীমতী অনুরাধা দেবী কর্তৃক অনুদিত— প্রেম ও প্রিয়া— ২৷৷০

বাংলা ভাষায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি

লিও টলষ্টয়ের "রেসারেকসান" ... ৩৲
ম্যাক্সিম গর্কির "তিনটি গল্প" ... ২৷০
ম্যাক্সিম গর্কির "ছোট গল্প" ... ২৲
ম্যাক্সিম গর্কির "ডায়েরী" ... ২৲
আইভান টুর্গেনিভের "ছোট গল্প" ... ১৸০
আইভান টুর্গেনিভের "তিনটি গল্প" ... ২৲

মনোরম অনুবাদ। পড়িতে পড়িতে মূলের আস্বাদ পাইবেন।

ইউ, এন্, ধর য়্যাণ্ড সনস্ লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

ক্যা ল্ র ন্

CALRON

(With Or Without Liver Proteolysed)

দুর্বল দেহের পুনর্গঠনের জন্য

'ইষ্ট ইণ্ডিয়া'র প্রস্তুত আদর্শ টনিক

এতে আয়রন, কালসিয়াম, গ্লিসারোফস্‌ফেটস্‌, ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স্‌ ইত্যাদি উপাদানের সঙ্গে রয়েছে আয়ুর্বেদোক্ত দ্রাক্ষারিষ্ট ও ১৭ পার্সেণ্ট আল্‌কোহল।

ক্যাল্‌রন্‌ আপনার দুর্বল স্নায়ুকে শক্তিশালী ক'রে ও শরীরে নতুন তাজা রক্ত সৃষ্টি ক'রে আপনার হারানো কর্মোদ্যমকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

বিশেষ বিবরণীর জন্য লিখুন—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ

৭১, রসা রোড, কলিকাতা-২৯

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক নববঙ্গ ভারতী প্রেস, ২৯/৩, ওয়েলিংটন

মুদ্রিত ও ৩০৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা— ১২ হইতে

পরিচয়

পর্যায় : ২য় সংখ্যা ফেব্রুয়ারী : ১৯৫০ মাঘ : ১৩৫৬

গোলাম কুদ্দুস :: সম্পাদক :: সরোজকুমার দত্ত

দাম : আট আনা

ইতিহাস দিয়েছে তার
নতুন আরেক নাম
সোভিয়েট-সারথি স্টালিন।
লেনিনের হাতে গড়া ইস্পাত কঠিন
বিশুদ্ধ লেনিনবাদী কমরেড স্টালিন—
আমরা স্টালিনবাদী,
আমাদের তুমিই লেনিন।

অন্নদাতা শিক্ষাদাতা ভয়ত্রাতা
অনশন-বন্দী দুস্থ নিঃস্ব শোষিতের
মুক্তিদাতা পিতা তুমি
মজুরের তুমি রাজশক্তিপ্রতিষ্ঠাতা
যৌথজীবনযন্ত্রে কৃষকের নবজন্মদাতা—
তুমি দুঃখে দৈন্যে রোগে অভাবে নিগ্রহে
পীড়িতের আতুরের পরিত্রাতা
প্রসবব্যথায় আর্ত নিরাশ্রয় লাঞ্ছিত নারীর
তুমি বন্ধু, বিপন্নের পতিতের নিঃশঙ্ক আশ্রয়,
বিধবার পুত্র তুমি, বিধবার অনাথ পুত্রের
তুমি নাথ, অন্ধের চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধের নির্ভর,
তরুণের সহকর্মী প্রেমিকের মর্মসহচর,
বালকের খেলার সঙ্গী শিশুর জননী তুমি
জননীর বুকে তুমি প্রাণরস মানবশিশুর।

তোমার হাতের 'পরে
আঁতুড়ে জন্মায় শিশু
পূর্ণাঙ্গ সুঠাম সুস্থ জননীর বিনা বেদনায়:
তোমার বুকের 'পরে
নিরাপদে শিশু সুখে শান্তিতে ঘুমায়:
তোমার পায়ের তলে
বিষদাঁত-ভাঙা ঘেয়ো
কুকুর লোটায়।

অপরূপ অপরূপ
কোমলে কঠোরে তুমি সুসংগত সম্পূর্ণ মানুষ।
তোমার হৃদয়
মমতার খনি যেন অন্যায়ে নির্দয়।
উদ্দেশ্যে অসংশয়
সিদ্ধান্তে অমোঘ তুমি
সিদ্ধহস্ত প্রয়োগে সার্থক।
নিষ্ঠায় নিষ্ঠুর তুমি
সংকল্পে অনন্যমনা
চূড়ান্ত পরীক্ষা কালে
নিজেকেও কর না ক্ষমা—
ক্ষমা নেই বস্তুনিষ্ঠ বিচারে তোমার।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে স'হে
জ্ঞানপাপী ভীরু ক্লীব ভণ্ড বেঈমান—
অব্যর্থসন্ধান
তোমার অলঙ্ঘ্য হাতে নেই নেই তাদের নিস্তার।
সম্মুখ সমরে কিংবা বুদ্ধির খেলায়
সমষ্টির বলে বলী
অপ্রতিদ্বন্দ্বী তুমি
দ্বন্দ্বের নিয়মে প্রাজ্ঞ
সমাধান কর দ্বন্দ্ব-বিরোধের বিপ্লবক্রিয়ায়।

বিপ্লবের শত্রু যারা
নররক্তমাংসলোভে যারা যুদ্ধ চায়,
তাদের পরম শত্রু
তুমি ক্রুদ্ধ মানবিকতার
মূর্ত প্রতীক সম
বর্বরের বিরুদ্ধে উগ্র উদ্দীপ্ত ঘৃণায়
মারীভয়মুক্ত প্রাণ-পরিপুষ্ট শান্তি-কামনায়
শোষকের রক্ত নিয়ে রক্ত দাও শোষিতের অসাড় শিরায়
সারা দুনিয়ায়

ইতিহাস দিয়েছে তার
নতুন আরেক নাম
সোভিয়েট-সারথি স্টালিন।
লেনিনের হাতে গড়া ইস্পাত কঠিন
বিশুদ্ধ লেনিনবাদী কমরেড স্টালিন—
আমরা স্টালিনবাদী,
আমাদের তুমিই লেনিন।

অন্নদাতা শিক্ষাদাতা ভয়ত্রাতা
অনশন-বন্দী দুস্থ নিঃস্ব শোষিতের
মুক্তিদাতা পিতা তুমি
মজুরের তুমি রাজশক্তিপ্রতিষ্ঠাতা
যৌথজীবনযন্ত্রে কৃষকের নবজন্মদাতা—
তুমি দুঃখে দৈন্যে রোগে অভাবে নিগ্রহে
পীড়িতের আতুরের পরিত্রাতা
প্রসবব্যথায় আর্ত নিরাশ্রয় লাঞ্ছিত নারীর
তুমি বন্ধু, বিপন্নের পতিতের নিঃশঙ্ক আশ্রয়,
বিধবার পুত্র তুমি, বিধবার অনাথ পুত্রের
তুমি নাথ, অন্ধের চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধের নির্ভর,
তরুণের সহকর্মী প্রেমিকের মর্মসহচর,
বালকের খেলার সঙ্গী শিশুর জননী তুমি
জননীর বুকে তুমি প্রাণরস মানবশিশুর।

তোমার হাতের 'পরে
আঁতুড়ে জন্মায় শিশু
পূর্ণাঙ্গ সুঠাম সুস্থ জননীর বিনা বেদনায়:
তোমার বুকের 'পরে
নিরাপদে শিশু সুখে শান্তিতে ঘুমায়:
তোমার পায়ের তলে
বিষদাঁত-ভাঙা ঘেয়ো
কুকুর লোটায়।

অপরূপ অপরূপ
কোমলে কঠোরে তুমি সুসংগত সম্পূর্ণ মানুষ।
তোমার হৃদয়
মমতার খনি যেন অন্যায়ে নির্দয়।
উদ্দেশ্যে অসংশয়
সিদ্ধান্তে অমোঘ তুমি
সিদ্ধহস্ত প্রয়োগে সার্থক।
নিষ্ঠায় নিষ্ঠুর তুমি
সংকল্পে অনন্যমনা
চূড়ান্ত পরীক্ষা কালে
নিজেকেও কর না ক্ষমা—
ক্ষমা নেই বস্তুনিষ্ঠ বিচারে তোমার।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে স'হে
জ্ঞানপাপী ভীরু ক্লীব ভণ্ড বেইমান—
অব্যর্থসন্ধান
তোমার অলঙ্ঘ্য হাতে নেই নেই তাদের নিস্তার।
সম্মুখ সমরে কিংবা বুদ্ধির খেলায়
সমষ্টির বলে বলী
অপ্রতিদ্বন্দ্বী তুমি
দ্বন্দ্বের নিয়মে প্রাজ্ঞ
সমাধান কর দ্বন্দ্ব-বিরোধের বিপ্লবক্রিয়ায়।

বিপ্লবের শত্রু যারা
নররক্তমাংসলোভে যারা যুদ্ধ চায়,
তাদের পরম শত্রু
তুমি ক্রুদ্ধ মানবিকতার
মূর্ত প্রতীক সম
বর্বরের বিরুদ্ধে উগ্র উদ্দীপ্ত ঘৃণায়
মারীভয়মুক্ত প্রাণ-পরিপুষ্ট শান্তি কামনায়
শোষকের রক্ত নিয়ে রক্ত দাও শোষিতের অসাড় শিরায়
সারা দুনিয়ায়

বহুক্ষণ ধরে পড়াশুনা করত।··· মা'র মনে হতে লাগল, যতই দিন যাচ্ছে ততই তার কথাবার্তা কমে আসছে, আর সে কথা বললে তার মধ্যে প্রায়ই এমন সব শব্দ বেরুতে শুরু করল যা মায়ের কাছে দুর্বোধ্য। প্যাভেলের কথাবার্তার মধ্যেকার কড়া রুক্ষ এবং গালাগালিওয়ালা জিনিসগুলো ঝরে গেল।"

অর্থাৎ বিপ্লবী রাজনীতির ছোঁয়া লেগে প্যাভেল ইতিমধ্যেই নতুন মানুষ হতে শুরু করেছে। দু'বছর এইভাবে কেটে গেল। ঔৎসুক্য চাপতে না পেরে মা একদিন জিজ্ঞাসা করে, "কী তুই সারাদিন পড়িস ?"

"এতে আমাদের মজুরদের জীবনের কথা লেখা আছে···আমাকে জেলে পুরবে কারণ আমি সত্যকে জানতে চাই।

"মার পক্ষে হঠাৎ বিশ্বাস টানা শক্ত হয়ে ওঠে। চোখ তুলে মা তার ছেলের দিকে চেয়ে থাকে, তাকে যেন এক নতুন মানুষ এবং যেন একজন অপরিচিত লোক বলে মনে হতে লাগল।

"মা জিজ্ঞাসা করল, কেন এগুলো পড় ?"

"আমি সত্যকে জানতে চাই।"

কি যেন একটা ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে মনে করে মা হঠাৎ কেঁদে ফেলে। প্যাভেল বলে, "কেঁদ না, ভেবে দেখ তুমি কি ধরনের জীবন কাটিয়েছ···চল্লিশ বছর তোমার বয়স হল, কিন্তু একে কি বাঁচা বলে ? বাবা তোমাকে ধরে ধ'রে মেরেছে, অথচ সে জানত না কেন তোমাকে সে মারছে !··· কারখানা বেড়ে যাচ্ছে···আর তার জন্য খেটে খেটে লোক মরছে।" প্যাভেল আরও অনেক কথা বলল, মা তার সবটা বুঝল না, তবে মায়ের সম্পর্কে প্যাভেল যা বলল তা মায়ের কাছে খুবই সত্য মনে হল, কাজেই প্যাভেলের সব কথাই মায়ের কাছে সত্য বলে মনে হল। মা জিজ্ঞাসা করল, "তা হলে কি করতে চাও ?"

"পড়তে চাই এবং তারপর অন্যকে শিখাতে চাই। আমাদের মজুরদের নিশ্চয়ই পড়তে হবে। আমাদের শিখতে হবে। আমাদের জানতে হবে—কেন জীবনটা আমাদের কাছে এত কঠিন।"

'মা' বইখানার মধ্যে বারে বারে বই পড়া, কাগজ পড়া এবং সত্যকে জানার চেষ্টার উল্লেখ আছে। বারে বারে প্যাভেল এবং অন্যান্য মজুররা বই পড়ছে, শিখছে এবং তর্ক করছে। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ফলে সাম্যবাদী চিন্তা যে আসে না, সেটা বুঝতে হলে যে বই থেকে পড়ে পড়ে বা শুনে শুনে থিয়োরী

আয়ত্ত করতে হয় 'মা'র মধ্যে বারে বারে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে গোর্কি দেখিয়েছেন। প্যাভেল সেই শ্রেণীর মজুর যাদের বলা হয় অগ্রগামী মজুর। প্যাভেল অন্য এক জায়গায় বলছে, "শত্রুদেরকে আমাদের দেখাতে হবে যে, তারা যে-দাসত্ব এবং অমানুষিক পরিশ্রম আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তা সত্ত্বেও বুদ্ধির ব্যাপারে আমরা তাদের উপরে তাল ঠুকে কথা বলতে পারি এবং মানসিক দিক থেকে আমরা তাদের থেকে অনেক অনেক উঁচুতে।" এই রকম রাজনৈতিক শ্রেণী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ মজুরকে সাহিত্যে সর্বপ্রধান স্থান ছেড়ে দিতে তাই বোধ করি বুর্জোয়া সমালোচকদের এত আপত্তি !

শুধু মজুর নয়, কৃষকের ভিতর যারা অগ্রগামী তাদের মধ্যেও কিভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের টানে বইপড়ার ইচ্ছাটা জেগে ওঠে গোর্কি তাও দেখিয়েছেন। গ্রামের খেতমজুর ইয়াকিম শহরে এসে উপস্থিত হয় বইয়ের সন্ধানে, প্যাভেলের বইগুলো সে নাড়াচাড়া শুরু করে এবং তারপর বলে, "তোমাদের তুলনায় গ্রামে বইপড়ার সময়টা আমরা বেশী পাই।"

প্যাভেল বলে, "কিন্তু পড়ার ইচ্ছাটা তোমাদের কম।"

ইয়াকিম উত্তর দেয়, "সময়টা এমন যে, হয় চিন্তা করো না হয় তো শুয়ে শুয়ে মরো। কিন্তু মানুষ মরতে চায় না।"

বইগুলো কি ধরনের হওয়া দরকার এবং তার ভাষা কেমন হবে ? রাইবিনের মুখ দিয়ে গোর্কি বলাচ্ছেন, "আমাকে বই দাও, এমন বই দাও যা পড়লে মানুষ চুপচাপ বসে থাকতে পারবে না। তার মাথার মধ্যে যেন জলন্ত পেরেকের মত ঢোকে। তোমাদের শহরের লোকদের বল, তারা যেন গ্রামের জন্যও লেখে। এমন জীবন্ত সত্য তারা লিখুক, যাতে গ্রামগুলো পাগল হয়ে যাবে, যাতে লোক মৃত্যুর দিকে ছুটে যাবে !" এরপর রাইবিন চিৎকার করে ওঠে, "যত সহজ করে পার তত সহজ করে লেখ, এমন সহজ যা পড়লে গরুর বাছুর পর্যন্ত বুঝতে পারে।" আমাদের বাংলার বিপ্লবী সাহিত্যিকদের এ থেকে নিশ্চয়ই শিক্ষা নেওয়ার আছে।

ইতিমধ্যে প্যাভেল এবং তার কমরেডদের সংস্পর্শে এসে মা'ও পরিবর্তিত হতে শুরু করে। মা তার নিজের পরিবর্তনকে লক্ষ্য না করে বরং প্যাভেলকে বলে, "মজুররা পরস্পরকে নিজেরা এত ঘৃণা করে ! তারা লোভ এবং হিংসার মধ্যে বাস করে ! পরস্পরকে ক্ষতি করতে পারলে তারা এত খুশী ! তারা শুধু মজা দেখার জন্য পরস্পরে এত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।"

বহুক্ষণ ধরে পড়াশুনা করত।··· মা'র মনে হতে লাগল, যতই দিন যাচ্ছে ততই তার কথাবার্তা কমে আসছে, আর সে কথা বললে তার মধ্যে প্রায়ই এমন সব শব্দ বেরুতে শুরু করল যা মায়ের কাছে দুর্বোধ্য। প্যাভেলের কথাবার্তার মধ্যেকার কড়া রুক্ষ এবং গালাগালিওয়ালা জিনিসগুলো ঝরে গেল।"

অর্থাৎ বিপ্লবী রাজনীতির ছোঁয়া লেগে প্যাভেল ইতিমধ্যেই নতুন মানুষ হতে শুরু করেছে। দু'বছর এইভাবে কেটে গেল। ঔৎসুক্য চাপতে না পেরে মা একদিন জিজ্ঞাসা করে, "কী তুই সারাদিন পড়িস ?"

"এতে আমাদের মজুরদের জীবনের কথা লেখা আছে···আমাকে জেলে পুরবে কারণ আমি সত্যকে জানতে চাই।

"মার পক্ষে হঠাৎ বিশ্বাস টানা শক্ত হয়ে ওঠে। চোখ তুলে মা তার ছেলের দিকে চেয়ে থাকে, তাকে যেন এক নতুন মানুষ এবং যেন একজন অপরিচিত লোক বলে মনে হতে লাগল।

"মা জিজ্ঞাসা করল, কেন এগুলো পড় ?"

"আমি সত্যকে জানতে চাই।"

কি যেন একটা ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে মনে করে মা হঠাৎ কেঁদে ফেলে। প্যাভেল বলে, "কেঁদ না, ভেবে দেখ তুমি কি ধরনের জীবন কাটিয়েছ···চল্লিশ বছর তোমার বয়স হল, কিন্তু একে কি বাঁচা বলে ? বাবা তোমাকে ধরে ধ'রে মেরেছে, অথচ সে জানত না কেন তোমাকে সে মারছে!··· কারখানা বেড়ে যাচ্ছে···আর তার জন্য খেটে খেটে লোক মরছে।" প্যাভেল আরও অনেক কথা বলল, মা তার সবটা বুঝল না, তবে মায়ের সম্পর্কে প্যাভেল যা বলল তা মায়ের কাছে খুবই সত্য মনে হল, কাজেই প্যাভেলের সব কথাই মায়ের কাছে সত্য বলে মনে হল। মা জিজ্ঞাসা করল, "তা হলে কি করতে চাও ?"

"পড়তে চাই এবং তারপর অন্যকে শিখাতে চাই। আমাদের মজুরদের নিশ্চয়ই পড়তে হবে। আমাদের শিখতে হবে। আমাদের জানতে হবে—কেন জীবনটা আমাদের কাছে এত কঠিন।"

'মা' বইখানার মধ্যে বারে বারে বই পড়া, কাগজ পড়া এবং সত্যকে জানার চেষ্টার উল্লেখ আছে। বারে বারে প্যাভেল এবং অন্যান্য মজুররা বই পড়ছে, শিখছে এবং তর্ক করছে। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ফলে সাম্যবাদী চিন্তা যে আসে না, সেটা বুঝতে হলে যে বই থেকে পড়ে পড়ে বা শুনে শুনে থিয়োরী

আয়ত্ত করতে হয় 'মা'র মধ্যে বারে বারে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে গোর্কি দেখিয়েছেন। প্যাভেল সেই শ্রেণীর মজুর যাদের বলা হয় অগ্রগামী মজুর। প্যাভেল এক জায়গায় বলছে, "শত্রুদেরকে আমাদের দেখাতে হবে যে, তারা যে-দাসত্ব এবং অমানুষিক পরিশ্রম আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তা সত্ত্বেও বুদ্ধির ব্যাপারে আমরা তাদের উপরে তাল ঠুকে কথা বলতে পারি এবং মানসিক দিক থেকে আমরা তাদের থেকে অনেক অনেক উঁচুতে।" এই রকম রাজনৈতিক শ্রেণী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ মজুরকে সাহিত্যে সর্বপ্রধান স্থান ছেড়ে দিতে তাই বোধ করি বুর্জোয়া সমালোচকদের এত আপত্তি!

শুধু মজুর নয়, কৃষকের ভিতর যারা অগ্রগামী তাদের মধ্যেও কিভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের টানে বইপড়ার ইচ্ছাটা জেগে ওঠে গোর্কি তাও দেখিয়েছেন। গ্রামের খেতমজুর ইয়াকিম শহরে এসে উপস্থিত হয় বইয়ের সন্ধানে, প্যাভেলের বইগুলো সে নাড়াচাড়া শুরু করে এবং তারপর বলে, "তোমাদের তুলনায় গ্রামে বইপড়ার সময়টা আমরা বেশী পাই।"

প্যাভেল বলে, "কিন্তু পড়ার ইচ্ছাটা তোমাদের কম।"

ইয়াকিম উত্তর দেয়, "সময়টা এমন যে, হয় চিন্তা করো না হয় তো শুয়ে শুয়ে মরো। কিন্তু মানুষ মরতে চায় না।"

বইগুলো কি ধরনের হওয়া দরকার এবং তার ভাষা কেমন হবে? রাইবিনের মুখ দিয়ে গোর্কি বলাচ্ছেন, "আমাকে বই দাও, এমন বই দাও যা পড়লে মানুষ চুপচাপ বসে থাকতে পারবে না। তার মাথার মধ্যে যেন জলন্ত পেরেকের মত ঢোকে। তোমাদের শহরের লোকদের বল, তারা যেন গ্রামের জন্যও লেখে। এমন জীবন্ত সত্য তারা লিখুক, যাতে গ্রামগুলো পাগল হয়ে যাবে, যাতে লোক মৃত্যুর দিকে ছুটে যাবে!" এরপর রাইবিন চিৎকার করে ওঠে, "যত সহজ করে পার তত সহজ করে লেখ, এমন সহজ যা পড়লে গরুর বাছুর পর্যন্ত বুঝতে পারে।" আমাদের বাংলার বিপ্লবী সাহিত্যিকদের এ থেকে নিশ্চয়ই শিক্ষা নেওয়ার আছে।

ইতিমধ্যে প্যাভেল এবং তার কমরেডদের সংস্পর্শে এসে মা'ও পরিবর্তিত হতে শুরু করে। মা তার নিজের পরিবর্তনকে লক্ষ্য না করে বরং প্যাভেলকে বলে, "মজুররা পরস্পরকে নিজেরা এত ঘৃণা করে! তারা লোভ এবং হিংসার মধ্যে বাস করে! পরস্পরকে ক্ষতি করতে পারলে তারা এত খুশী! তারা শুধু মজা দেখার জন্য পরস্পরে এত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।"